SOUVENIR—1986

150th Birth Anniversary
of
SRI RAMAKRISHNA
AND
Centenary Celebration
of
THE RAMAKRISHNA SANGHA

RAMAKRISHNA MISSION CALCUTTA STUDENTS' HOME
Belgharia, Calcutta-700056
Have faith in yourself—all power is in you—be conscious and bring it out. Even the poison of a snake is powerless if you can firmly deny it.

—Swami Vivekananda

With compliments from:

SUR IRON & STEEL CO. LTD.
15, CONVENT ROAD
CALCUTTA-700014
SOUVENIR 1986

150th Birth Anniversary
of
SRI RAMAKRISHNA
AND
Centenary Celebration
of
THE RAMAKRISHNA SANGHA

RAMAKRISHNA MISSION CALCUTTA STUDENTS' HOME
Belgharia, Calcutta-700056
Published by
Swami Amalananda
Secretary,
Ramakrishna Mission Calcutta Students' Home.
Belgharia, Calcutta-700 056

December 1986

© Copy Right Publisher

Price: Rs. 10.00 only

Printed by
Rama Art Press
6/30, Dum Dum Road.
Calcutta-700 030
Phone: 52 4419
PREFACE

We are glad to announce that depending on the grace of the Almighty, the Ramakrishna Mission Calcutta Students’ Home, Belgharia, is going to observe the 150th Birth Anniversary of Sri Ramakrishna and the Centenary celebration of the Ramakrishna Order along with the Seventeenth tri-annual Re-union of its past and present students during the month of December, this year.

Though the Students’ Home became a branch of the Ramakrishna Mission in 1919, its life is counted from 1916 as it was then that the infant institution took the definite shape of a Brahmacharya Ashrama. Thus, by the grace of Sri Guru Maharaj, the Students’ Home is completing this year the 70th (Seventieth) year of its useful existence.

The celebration begins on December 24 because the date has a special significance. It was on this day that the Home was blessed by the holy visit of Srimat Swami Brahmanandaji Maharaj the first President of our Order. The Home was singularly lucky in receiving in abundance the blessings of other apostles of Bhagavan Sri Ramakrishna too, some of whom sanctified the institution by their august visit on different occasions.

It is in the fitness of things that on this occasion a Souvenir with relevant informations is being published. It opens with the blessings of the President and the Vice-President of the Ramakrishna Order to whom we owe a deep debt of gratitude.

It is gratifying to note that the ex-students of the Home have enthusiastically come forward to assist their Alma Mater in going through an elaborate programme suitable to the occasion.

Many stalwarts among its friends, including the Founder-Secretary, Swami Nirvedananda, his two first able assistants, Swami
Santoshananda and Swami Vishokananda and our beloved former Secretary Swami Dhyanatmananda, whose unbounded zeal and enthusiasm carried the institution through many ups and downs to its present position, are no more with us. May the great departed souls rest in peace.

We take this opportunity of conveying our grateful thanks to all our friends and sympathisers whose active support and hearty co-operation enabled the organisers to carry out their humble task.

12.12.1986

Publisher
MESSAGE

I am glad to know that the Ramakrishna Mission Calcutta Students’ Home, Belgharia is going to observe the Centenary Celebration of the Ramakrishna Order and the 150th Birth Anniversary of Sri Ramakrishna along with the seventeenth triennial Reunion of its past and present students during the month of December this year, and also bring out a Souvenir to mark the occasion.

It is also a matter of satisfaction that the Students’ Home is completing the Seventieth (70th) year of its useful existence by December 1986. During its long career the Home has been trying to spread higher education, particularly among the poor but meritorious students from rural areas, and to disseminate the teachings of Swami Vivekananda, specially his ideal of service, among the educated youth. The Home can well be proud of its ex-students who are efficiently serving the country in various fields as good citizens, and many of whom have dedicated their lives for the service of humanity as monks of the Ramakrishna Order.

May Sri Thakur, Ma and Swamiji shower their blessings on the Home and on all those associated with it is my earnest prayer.

I wish the functions all success.

(Swami Gambhirananda)
President
Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission.
यो अप्र्द्धाप चिद्धाप हि पूर्वः
यो वं वेदांक्ष्य प्रहिष्योति तस्माः॥
तं हि देवमाल्यमप्रविष्टकारां
रुपर्थ्य शरणमहं प्रपधे॥

—शवेतात्त्वर
শুভ ভাগ্য

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতায় কুড়িসুঘরে বেশিরভাগই শ্রীরামকৃষ্ণদের
ষোড়শ আবির্ভাবের সার্ধালততম বর্ষপূর্তি মহোৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনের
অষ্টমী উৎসব পালিত হয়েছে। তার সাথে প্রতিষ্ঠানের ৭০ (সাত) বছর পূর্বের
উৎসব এবং পাঁচ ও বর্ষান্ধ মাসের মৃন্ময়ী নদীর দুর্গাপন্থী বৃদ্ধদের মিশনদের নিমন্ত্রণ বর্তে অনুষ্ঠিত
হয়ে জেনে সুখী হয়। কুড়িসুঘরের উৎসবকে ঈশ্বর ইতিহাসের সাথে
ধরা পরিচিত অর্জন করারই জানন, মাসের কল্যাণের কথা এই প্রতিষ্ঠানের
সেবাকর্মী কভুদুর সাধ্যার পাতান করছে।

অনুষ্ঠানগুলি বেনে তুর কথায় দুর্গাপন্থী সম্পন্ন হয় এবং এই পরিবর্ত
প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘকাল বর্তে তার অনবরত সেবাকর্মী সকলকার সাথে চালিয়ে
যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে এই ধার্মিক জানাচ্ছে।

আমি- বক্তব্য

সহ-সভাপতি
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন।
ॐ सह नाभसु। सह नो चुनक्षु।
सह बोधं करबावहै
तेजस्विनावनधित्मस्तु मा विद्विपावः।
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥
——कठोपनिषत्

वदुक्षिंच्छ प्रणिपातेन परिप्राप्तेन सेषयाः।
——गीता
CONTENTS

Preface
Message
President
Vice-President

শাস্ত্র বাণী
শ্রীশ্রীরামের উপদেশ
Swamiji’s Testament
প্রার্থনা
শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশিত ভগবৎ প্রাপ্তির সহজ উপায়
শ্রীরামকৃষ্ণঃ এক নূতন ধর্মের প্রবক্তা
মায়ের কথা
শ্রী শ্রী রাজা মহারাজ
সহরে জল সর্ববাহ
সর্বসম্ভায় ব্রহ্মজ্ঞান

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিবা

শ্রীবৈষ্ণব উদ্ধান
শ্রীম শ্রীম বীরেশ্বরানন্দের মহারাজ শরণে
আনন্দময় পুরুষ নুপেনদা
শ্রীবীর মরণের শীমানা চাড়ায়ে
স্নেহিতপর্ণ—বিবাহার্য আশ্রম
দেশদ্ধ চিত্তকরের বীর-বালক—নুপেন
শ্রীধামানন্দ শ্রবণম্
প্রাথিক প্রাপ্তিত
পঞ্চাশির কালী দেখা
আবরণ
ওড়িশা ভক্তিসঙ্গীত
ফটকের জলায় প্রতিবেদন
ধুমকেতু অসচে
স্বধর্মদিতী—একটি বিবিধ
পরম করণাময়ী শ্রীশ্রীসারদা দেবী

শ্রীযুগযুগীয়
শ্রীমুখার্জুন
শ্রীমজ্জলী রায়
শ্রীযুগেশ সেন
শ্রীতরঙ্গনাথ মিশ্র
শ্রীসৌময়নাথ ঘোষ
শ্রীকালোরণ মাহভী
শ্রীথামিশ্র চক্রবর্তী
শ্রীস্বরূপ বিহারী দেবনাথ

13
17
23
27
31
35
42
47
51
54
56
59
60
61
67
69
72
73
77
80
82
English:

Programme
The task before us
The Ramakrishna Mission
At the cross-roads
From oceans to mountains
About the Founder
Through Eminent Eyes
A few words about the Institution
Swami Vivekananda—A real man
The role of youth in rural reconstruction
Sun Rise
Swami Vijnanananda Smriti (An appeal)
ষষ্ঠ বাণী

ফত মত তত্ত্ব পথ।

সকল ধর্মই সত্য। ধর্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। যেমন এই কালিবাল্যীতে আসতে গেলে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ হেঁটে আসে। নদী সব নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক।


সত্যকথাই কলির তপস্যা। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে সত্যের ভগবানকে পায়। সত্যকে আঁট করে ধরে রাখলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনো মিথ্যা হতে দেন না।

বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়—আমাকে ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও। বালকের মতো বিশ্বাস না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন, “ও তোর দাদা”; বালকের আমনি বিশ্বাস নে, ও আমার বোল আনা দাদা।

শাক্তের ভেতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? শাক্ত পড়ে অস্তিত্বের বোধ হয়। বই হাঁচার পড়ে, মুখে হাঁচার খোক আঁড়াও, ব্যাকুল হয়ে উঠতে ডুব না দিলে, তাকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভুলাতে পারবে; কিন্তু তাকে পারবে না।

—ব্রহ্মধর্ম}
“ঝাকরের উপদেশ

ঝাকরের আবির্ভাব থেকে সত্যচর আরম্ভ হয়েছে।”

ঝাকর এবার এসেছে ধনী, নির্বিশ, পঞ্চাক, মূর্ধ, সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া
খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধর্ম হ’য়ে যাবে।”

“যে ঝাকরের শরণাগত, তার অন্তরালেও কিছু হবে না।”

“যে একবার ঝাকরকে ডেকেছি তার অন্তর ভয় নাই।”

ঝাকরের ছাড়া কিছু হবার সাধ্য নেই, তৃণটিও নড়ে না। যখন ঝাকরের সুসময় আসে
তখন ধ্যান চিন্তা আসে, কুসময়ে কুপ্রভৃতি, কুমোগাঙ্গোষ্ঠ হয়। তার যেমন ইচ্ছা তেমনি
কলে সব আসে, তিনি তার ভিতর দিয়ে কার্য করেন। নরেনর কি সাধ্য? তিনি তার
ভিতর দিয়ে সব করলেন বলেই ত নরেন সব করতে পেরেছিল?
ঝাকর বেটী করেবেন, তার তাঠক করা আছে। তবে ঠিক ঠিক যদি কেউ তার উপর
ভার দেয়, তবে তা ঠিক করে দেবেন।”

ঝাকর বলতেন, আমি ছাড় গড়ে গেলুম, তোরা ছাড়ে ঢেলে তুলে নে। ……… ছাড়ে
চালা মাত্রে ঝাকরকে ধ্যান চিন্তা করা। ঝাকরকে ভাববেই সব ভাবে আসবে। তিনি
যেমন চিন্তা করেছেন, তা চিন্তা করা।”

“তিনিই রাম মা হয়েছেন। তিনি রাম মা রাম পালন করছেন। তিনিই দেখছেন।”

ঝাকরের শরণাগত হ’লে বিধির বিধি খণ্ডন হ’য়ে যায়। তার নিজের কলম নিজ হাতে
কাটিয়ে হয়।”

“ভয় নেই রাবা, ঝাকর আছেন, তিনি তোমাদের ইহকাল পরকাল রক্ষা করবেন। ভয়
কি রাবা, তাকে খুব ডাকলেই সব বিষয়ে তিনি এসে রক্ষা করবেন।”

“তিনিই মহেশ্বর তিনিই মহেশ্বর, তিনিই সর্বকল্যাণ, তিনিই সর্বজীবন।”

—শ্রীকৃষ্ণান্ন
Swamiji's Testament

My hope is to see again the strong points of that India, reinforced by the strong points of this age, only in a natural way. The new state of things must be a growth from within.

"So I preach only the Upanishads. If you look, you will find that I have never quoted anything but the Upanishads. And of the Upanishads, it is only that one idea—Strength. The quintessence of Vedas and Vedanta and all, lies in that one word. Buddha's teaching was of Non-resistance or Non-injury. But I think this is a better way of teaching the same thing. For behind that Non-injury lay a dreadful weakness. It is weakness that conceives the idea of resistance. I do not think of punishing or escaping from a drop of sea-spray. It is nothing to me. Yet to the mosquito it would be serious. Now, I will make all injury like that. Strength and fearlessness. My own ideal is that giant of a saint whom they killed in the Mutiny, and who broke silence, when stabbed to the heart, to say—'And thou also art He!'

"But you may ask—What is the place of Ramakrishna in this scheme? He is the method, that wonderful unconscious method! He did not understand himself. He knew nothing of England, or the English, save that they were queer folk from over the sea. But he lived that great life,—and I read the meaning. Never a word of condemnation for any! Once I had been attacking one of our sects of Diabolists. I had been raving on for three hours, and he had listened quietly. 'Well, well!' said the old man as I finished, 'perhaps every house may have a back door. Who knows!'

"Hitherto the great fault of our Indian religion has lain in its knowing only two words—Renunciation and Mukti. Only Mukti here! Nothing for the householders! But these are the very people whom I want to help. For, are not all souls of the same quality? Is not the goal of all the same?

"And so strength must come to the nation through education."

—The Master As I Saw Him
শ্রাধনা

ও অসতো মা সস্ত গময়, তমসামা জ্যোতির্গিমি
মৃত্তোম্যুনব গময়, আবিরাবি ম্যি এধি ॥

রূপ্ত ! যতো দক্ষিণ মূখ তেন মা পাশি নিত্যাম ॥
কেমের মাতা চ পিরা তমব, কেমের বদ্ধশত সথা তমব ।
কেমের বিষ্ঠা জ্যোতিঃ তমব, কেমের সরকি মম দেব দেব ॥

অদত্র হইতে আমাকে দত্তা প্রতিষ্ঠিত কর, অজন্ত অন্নকার হইতে জনের জ্যোতিঃতে লইয়া
চল, মৃত্তো হইতে আমাকে অধ্যাক প্রদান কর। হে যশগাত্র ! তুমি আমার, হহে আবিশুট্রং হহে,
হে কৃষ কর্ষাঘোষাতে তুমি আমাকে সর্বসম রঞ্জা কর। আমার জীবন শান্তিময় হউক ।

তুমি মাতা তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সথা। আবার তুমিই বিষ্ঠা, তুমিই সমপদ ;
হে দেব-দেব ! তুমিই আমার সর্বস্ম।

শুধুন্ত বিশ্বে অমৃতস্তত পুত্রা
আ যে ধামানি দিবাচনি তন্ত্র:
বেদাভাব পুংক্ষ মহাত্মাম
আদিত্যবর্ণ তমসঃ পরুণ্ত্ব
তমের বিদ্যা হতুম্রুত্রমুজমেতি
নায়ে পুত্রা বিদ্যাতে হয়নায়।

হে দিবাধামের প্রথমানি অদুতের পুত্র, আবিণুরা শ্রবণ কর। আমি পরিপূর্ণ সর্বাধিক, হয়ে
প্রেকাশ ও অবিষ্টাত্ম প্রস্তাতে জানিয়াছি। তোহায়েই মাতা জানিয়া (বিবাহ) মৃত্তোকে অতিতেম
করিয়া ধাকেন ; সাধার উত্তরণের অন্তঃকেন পথ নেই।
'যাবৎ বীচি তাবৎ শিক্ষা'
—শ্রীরামকৃষ্ণ
'যদি শান্তি চাও মা, কাফর দোষ দেখো না' 
—শ্রীমা
ঝীরামকুঞ্জের বিদ্রেষিত জন্ম প্রাচীর সহজ উপায়

আমীর ভূতেশ্বর

রাজা পরীক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র সাতদিন, সাতদিন পরে সর্প- দংশনে তার মৃত্যু হবে। জীবনের অবশিষ্ট সেই সাতদিন নির্বাসনের জন্য তিনি রাজপ্রাসাদ পরিতাপ করে এসে গঙ্গাতীরে প্রায়োপ- বেশন করলেন এবং অন্ততঃ কৃষ্ণপাদপূজা চিন্তা করতে লাগলেন। সেইসময় বিশিষ্ট ঋষিকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হবেন। রাজা তাদের প্রার্থনা করে আই অতিমহাদেব তার কি করা উচিত জানতে চাইলেন।

তারা কেউ তাকে যা হাসিয়া, কেউ তার প্রতিদিন কেউ বা দাখিল করতে বললেন। একজন যে দুর্ভুত করে পরিতাপ করতে শুধুমাত্র সেখানে উপস্থিত হবেন। রাজা ভূতেশ্বর হয়ে তাকে প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, আপনি যে ব্যক্তির পরিসীমা, আপনি বলুন মৃত্যুবার এবং মৃত্যু ভাবনা কি করে সিদ্ধি লাভ করবে।

কোন কর্ম তার কর্তব্য এবং কোন কর্মই বা অকর্তব্য আপনি বিষয়ে আমাকে উপস্থাপন দান করুন। আমার জীবনের অতিমহাদেব অসার।

এই অন সময়ের মধ্যে এমন কিছু বলুন যাতে আমার কল্যাণ হয়।

শুধুমাত্র তত্ত্঵ে বললেন, যিনি মৃত্যু করায় করেন উত্তর পক্ষে ভগবান হরিকে ভ্রান্ত করার, তার নাম শ্রবণ করিন একাধীত করবে। এই বলে শুধু- দেব পরীক্ষিত ভগবানের লীলাকথা বলতে আচ্ছাদন করলেন—শেষ জীবন মাত্রের যা পরম সম্পদ।

তপস্যা, যাগযজ্ঞ, জ্ঞানবিদ্যা করতে সময় লাগে, চিন্তাগঞ্জির ভাবের সময় লাগে, সবই সময় সাপেক্ষ।

ভগবানের কথা শুনলে তার কর্ত্তার মাত্রাকে অতি আর সময়ের মধ্যে কল্যাণ হয়। তাই শুধুমাত্র ভগবানের কথা শুনবার অর্থ আর নয়। আর তার মৃত্যুর কথা প্রতিবাদ করতে গোলবার সন্ধে মনে করলেন। ভগবানের লীলাকথা বলবার এমন যোগ বন্ধ আর নেই। আর মনুষ্যের জন্য প্রতিবাদ পরীক্ষিতের মতো স্রোতাটো আর নেই। মনী-কাক্ষা সম্পূর্ণ।

ভগবানের কথা তো অনেক—তরু আশচর্য হতে- হয় যে সমগ্র ভগবানে হত তবে ভালো হয় সে সমস্ত শুধুমাত্র সাতদিনের মধ্যে শুনিয়েছিলেন। আর সেই কথাই ভগবত লাল। রুপ লাভ করেছে। এই ভগবতপুরাণের রচিতিত বেদব্যাস, বলুন শুধুমাত্র।

আর মৃত্যুর কথা প্রতিবাদ করতে গোলবার সন্ধে মনে করলেন স্রোত।

কি চক্ষুকার কথা—জীবনের আর সাত দিন মাত্র বাকি আছে। এমন কিছু শোনান যাতে আমার কল্যাণ হয়। আমরা কি জানি আমাদের জীবনের আর সাতদিনও বাকি আছে কি না। পর মৃত্যুতে জীবন থাকবে কি না তাই জানি না। এফেক্টে ভগবানের কথা শুনবার জন্য পরীক্ষিতের যেকথার আগের হয়েছিল আমাদের তাঁর চেয়েও বেশী আগের হবার কথা। মৃত্যু অবধারিত জেনে ভগবানের কথা শুনবার জন্য পরীক্ষিতের মনে যে ব্যাকুলতা। এসেছিল আমাদের কি সেকথা এসেছে নি নিশ্চয়ই নয়।

সহকারী অধ্যক্ষ, ঝীরামকুঞ্জ মঠ ও মিশন।
সেই বাক্য। যাতে আসে, প্রভুর উদ্দেশ্য হয় তার মায়া আমাদের ভুগত্তা কথা শোনা, সংক্ষিপ্ত সংস্কৃতি করা দরকার।

ভাগবতে আছে কবি, হবি প্রভৃতি ধৃষ্টিদর্শকের মহাযোগী নয় পুরুষ মহাভারত নিমিত্ত বসতি উপস্থিত হয়েছিল। তাদের দেখা নিমিত্তে তা বাই আধিক খাসাই এমনকি বাক্যের অর্থ সম্পর্কে উঠে তাকে অভাবনী করলেন। নিমিত্তে তাদের বললেন,

’ধর্মান্ত ভাগবতন লত যদি নি ক্ষত্রয়ে কম্।’

(ভাষা ১১২/৩১)

—আমারা যদি ভাগবত ধর্ম শুনবার যোগ্য হই তবে সে বিষয়ে কিছু উপদেশ দিন। তখন ঋষিদের মধ্যে কবি বললেন,

’যে বৈ ভাগবতা প্রোক্তা উপায় হায়কলয় অজ্ঞ: পুস্মাবিহৃত্বা বিষ্ণু ভাগবতঃ হি তন্ম্।’

(ভাষা ১১২/৩৪)

—ভাগবত ধর্ম কাকে বলে? যে ধর্মগুলি ভগবান নিজে বলছেন, কাকে দিয়ে বলছেন না, আর যাকে আশ্রয় করে ভগুণ অনায়াসে তাকে লাভ করে। বলছেন কারের জন্য? যারা অজ্ঞ তাদের জন্য।

অজ্ঞ: পুস্মাবিহৃত্বা—অজ্ঞ ব্যক্তিরাও যা অনায়াসে বুদ্ধি পারে। তাদের জন্য শুধু বর্ণনাই করেননি সহজবোধ করে বলেছেন। এই হল ভাগবত ধর্ম।

কথাগুলি ভাগবত ধর্ম। ভাগবতের যা অমৃত, কথা-

মূর্ত তাই বলা হয়েছে। এমন ভাবার বলা হয়েছে যা মূর্ত্তেরাও বুদ্ধিতে পারে।

ভগবান আবিষ্কৃত হন সাধারণ মায়ায়ের জন্য, বড় বড় পাথরদের জন্য নন। ঠাকুর এক জায়গায় মাকে বলছেন, কলকাতার লোকেরা যেন কৃমির নেতা ছড়িয়ে করাতে। তাদের জন্য কিছু করার না। শুধু কলকাতার লোকের জন্য নয়, জগৎ শুধু লোক। যারা কৃমির নেতা। ছড়িয়ে করাতে তাদের জন্য তিনি এসেছেন, বড় বড় পাথর, যোগী সাধুদের জন্য নয়। করণ পাথরদের চেয়ে তাদেরই এরোফিউ সবচেয়ে বেশি। যারা নিজের শক্তিতে এগিয়ে যোগ পারে তাদের অপারের সাহায্য দরকার হয় না। কিছু যাদের সে সামর্থ্যেই যায়। অসহায় তাদেরই ভূখ ভগবানের আদর্শ। যেমন অক্ষর অসহায় সাধুর প্রতি তাদের নেই সবচেয়ে বেশি হয়।

ঠাকুর এই সাধারণ মায়ায়ের বর্ণা করেছেন যে তারা বন্ধ হীর। কিন্তু তারা যে বন্ধ তা জানে না। তাই তাদের বন্ধ থেকে মুক্তির কোনো চেষ্টা নেই। জানে মধ্যে আটকা জান মুখ করে যোগ পারে। তারা সে নিরাপদে। জানে না এককী জেলে এর ভাগায় সেনে তুলবে আর প্রাণ যাবে। এই বর্ণার ভিতর কখনও আছে কিছু তবু তাতে আমাদের চেষ্টা হয় না। একজন প্রাণ করলেন, মশাই, তাহলে কি বন্ধজীবির কোনো প্রভূতি দেই? শহীদকুঠি বলছেন, তাহলে না কেন, আছে বে কি। জের দিয়ে বলছেন, নিষ্ক্রিয় আছে।

উপার্গুলিও অতি সোজা—ভগবানের নামে গান, নিতান্ত বন্ধুর বিষয়কার, সাধু সঙ্গী তার মাঝে মাঝে নিজের বসায়। পাথরদের মত বন্ধুর বিষয়কার না পারলেও সাধারণ মায়া তারা বুদ্ধিতে পারে। কোনো নষ্ট আর কোনো নয়। তার নাম গুণগত করে তাদের মন শুধু হয়, সেই শুধু মনে ভগবানের প্রতি ভালবাসা আসে। তার নাম মায়ার এমন যে তা কখনও বুদ্ধি যেতে না। সাধু সঙ্গী মনে এমন ব্যক্তির সঙ্গ যিনি ভগবানে নিয়ে
থাকেন, আর যার কাছে গেলে ভগবানের কথা মনে পড়ে। তাতেন পরিপূর্ণভাবে তাকে প্রাপ্তির উপায় বলেছেন।

ভগবান নিজেই তাকে প্রাপ্তির উপায় বলেছেন।

আর বলছেন এমনভাবে যা মূর্তিতে রুক্তে পারে এবং অমায়াসে করতে পারে। বলেছেন, এখন তোমাদের আগ্রহ প্রাপ্তি, অত পারে না। অন্তঃকরণ ভাবে ভগবানের নাম কর তাতেই কল্যাণ হবে। একবার তিনি বলেছেন, ভগবানকে ব্যাবলি মা রক্ষে তাকে হয়, এইরকম করে তাকে। বলেছেন, একবার তুমি মাতিতে পড়ে তাতে পারে, আর তাতে করে হয়।

তাকে ভাল করে দেখে যে মনে নাচটিতে পড়ে তাতে পারে, তাতে করে হয়।

ভগবান লাভের যে উপায় শীর্ষাকর্মী নির্দেশ

করেছেন জগৎ জুড়ে তা প্রার্থী করছেন যার নিজের দেখিনীতে মোটে তার কৃতি সাহায্য। আভিজ্ঞ ঠাকুরের কথা সমস্ত জগতের লোক সাধে শুনছে ও তারিফ করছেন। তারা বলছে, এত গভীরভাবে এমন সহজভাবে যিনি বলতে পারেন তিনি না

জানি কত বড়। ধর্ম জীবনের যত কিছু সমাহ ও তার সমাধান কথাতে পাওয়া যায়। অথচ ঠাকুর কেনা। প্রাপ্তি করায় বলতেন, আমি জানি না, মাঝে

জিজ্ঞাসা করব। অথবা যখন অনুভূতি ধারায় তার উপাদেশ চলত তখন তিনিই সেই না ছোড়া আর কিছু

নেই। তার নিজের কেনা। ব্যক্তিই আছে বলে

তিনি মনে করতেন না। বলতেন, তুমি যেমন চালাও

তমনি চলি, যেমন চালাও তমনি বলি, যেমন করাও

তমনি করি। রামকৃষ্ণ নামে একটি খোলা, তার

ভিতরে পরিপূর্ণভাবে জগমাতা বা জগদিশ্বরের সন্ত।

ভগবানের নিজেই তাকে প্রাপ্তির উপায় বলেছেন।

আর বলছেন এমনভাবে যা মূর্তিতে রুক্তে পারে এবং অমায়াসে করতে পারে। বলেছেন, এখন তোমাদের

অগ্রহ প্রাপ্তি, অত পারে না। অন্তঃকরণ ভাবে

ভগবানের নাম কর তাতেই কল্যাণ হবে। একবার

তিনি বলেছেন, ভগবানকে ব্যাবলি মা রক্ষে তাকে হয়, এইরকম করে তাকে।

বলেছেন, একবার তুমি মাতিতে পড়ে তাতে পারে, আর

তাতে করে হয়।

ভীতে হয় কাহারু

পরিপূর্ণভাবে জগমাতা বা জগদিশ্বরের সন্ত।

ভগবানের নিজেই তাকে প্রাপ্তির উপায় বলেছেন।

আর বলছেন এমনভাবে যা মূর্তিতে রুক্তে পারে এবং

অমায়াসে করতে পারে। বলেছেন, এখন তোমাদের

অগ্রহ প্রাপ্তি, অত পারে না। অন্তঃকরণ ভাবে

ভগবানের নাম কর তাতেই কল্যাণ হবে। একবার

তিনি বলেছেন, ভগবানকে ব্যাবলি মা রক্ষে তাকে হয়,

এইরকম করে তাকে।

বলেছেন, একবার তুমি মাতিতে পড়ে তাতে পারে, আর

তাতে করে হয়।

ভীতে হয় কাহারু।
বৃষ্টির দ্বারা হয় না, বহু শাত্রা পড়লেও হয় না—
‘ন মেধার ন বল্লা। শুভ্রে, বয়েছ বৃষ্টি কেন
লভা’—তিনি যাকে বরণ করেন রূপ। করেন সেই
শরণাগতি। শরণাগতি বার বার বলা হয়েছে,
তাকে লাভ করতে পারে। সাধন করে আমরা
আবার তারে বলি, যদি আমরা কিছু না-ও
তাকে লাভ করব এরকম অভিমান করা বুখ।
এট করতে পারি তাহলে কেবল তার শরণাগত হলে
সাধন মাধ্যম করতে পারে না যে তার দ্বারা
সব হবে।

“বিজ্ঞান—কি না বিশেষরূপে জান। কেউ ছুঁড় জনেছে, কেউ ছুঁড় দেখেছে,
কেউ ছুঁড় থেকেছে। যে কেবল জনেছে, যে অজান। যে দেখেছে সে জানিও;
যে থেকেু, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বরের দর্শন
করে তার সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়, এতই নাম বিজ্ঞান।”

—ঝীরামকৃষ্ণ
ধর্মের কথা চলতে গিয়ে ধারাজী ভারী সুন্দর উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করেছেন। একটি মন্তব্য রেলগাড়ি আর একটি এল্পাড়ে রেল লাইনের উপর, পিপড়াটি একটা সামাজিক জীব। রেলগাড়িটি ক্রুত্ব বেগে আসছে। পিপড়াটি সরে গেল। একটা হয়তো পাল্লী বসে ছিল, রেলগাড়িটি দেখে সে উড়ে গেল। ধারাজী বাক্যা করে দেখালেন, একটি বাগানী সে যত কাদই হয়ক, তার এই নিজস্ব শক্তিটুকু আছে। কিন্তু এই যে বিরাট যথহ, যার এই বেশি শক্তি, সে ছুটে চলেছে। কিন্তু ছুটে চলার পিছনে তার নিজস্ব কৌন শক্তি নেই। সে সঞ্চয়িত।

তাকে কেউ চালাচ্ছে, তবেই সে চলেছে। কারণ অতশুধী একটা মহদ্যনির্নয় হলেও, সে কিন্তু জড়। আর এই যে সামাজিক প্রাণী—সে চেতন। আবার মানুষের দিকে যখন তাকাই, তখন দেখি—সে রেলগাড়ি তৈরি করেছে, রেল ইন্ধন তৈরি করেছে। তার ভিতরে আরও অনেক বেশি শক্তির প্রকাশ। মানুষ হুমার গতিতে অনন্তকালের প্রায় ছুটে চলেছে।

কত কেঠম প্রচেষ্টা, কত সংগ্রাম,—যুগ্য যুগে ধরে মানুষ করেই চলেছে। কিনের জর তার এই সংগ্রাম।

মানুষ যখন এই বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করে, তখন সে কি দেখতে পায়? দেখতে পায় যে, তাকে যেন কত বডনে আঁকে রাখা হয়েছে। কালের বল্দন, ব্যবধানের বল্দন এবং আরও কত রকমের

ঐতিহ্যবাহী স্বাস্থ্যবিদ্যা জ্ঞান।

সহ-সংগ্রহক, ধারাজী মঠ ও রিপোর্ট।
বন্ধন। তার অনেক কিছু সে বুঝতেও পারে না, জানতেও পারে না। কিন্তু সে বুঝতে চায়, জানতে চায়। মানুষের মন যত স্পর্শ হয়, যত তার ভিতরের আন্তরিক প্রকাশ হয়, তত সে সমস্ত বন্ধনকে ভেঙে ফেলতে চায়। সে নিজে আন্তর্হ হতে চায়, স্বাধীন মুক্ত হতে চায়। কিন্তু একসময় সে দেখে যে, সে অসহায়। আর এগুলো পারে না। আর কিছুই ধরতে পারে না, মনে হয় যেন থেমে যাচ্ছে। তবুও সে সংগ্রাম করছে। সে দেখছে যে আমি চেষ্টা করছি, বুঝতে পারছি যে আমি যা চাই, তা আমার হল না। আমি যা চাই তা পেলাম না। এত রূপ-রসে ভরা এই সুন্দর জগৎ। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে— না, না, তাতে আমার লেট ভরে না। বুঝতে পারছি—আরও যেন কিছু আছে। আরও ছড়, আরও মহৎ, আরও সুন্দর। সে জানে তার জীবন ক্ষণিক। তার যত কিছু খেলা, যত কিছু গড়া, সব এক নিম্নের বস্ত্র হয়ে যাবে। এই রকম ভেবে তখন তার একটি নৈরাজ্য আসে। সে তখন যেতে এমন একটা কিছু শক্তি, এমন একজন কারণ সাহায্য, যা তার নিজের এবং অন্য সকলের চেয়ে বড়। সে নিজে সমীম। কিন্তু তার ভিতরে ইস্তফ্য আসছে, আভাস আসছে অসীমের। তখন সে বুঝতে পারছে যে, এই সীমার মাঝে অসীমকে ধরা যাবে না। এই সীমাতে শক্তি দিয়ে অসীমকে আমি বাঁধতে পারব না। ভিতর ভিতর যোগ তাই আমার। দেখি মানুষের এই সমস্ত প্রচেষ্টা ভিতর দিয়ে সে নানা-রকমভাবে একটা বাইরের শক্তির কাছে সাহায্য চায়। এ যোগের ভাবায় বলতে গেলে, আমি যেমন যুদ্ধ বিগ্রহের সময় বাহিরশীল শক্তির কাছে সাহায্য চাই। মানুষের সেই রকম যার কোন বাইরের শক্তির কাছে। কোথাও একটু বুঝি অনুক্ষেপকর স্পর্শ পাবে, কেউ ছাড়া দেবেন, কেউ ভয় দেবেন, কেউ একটা কিছু করে দেবেন। এই যে অজ্ঞানার প্রতি একটা আকর্ষণ, অসীম শক্তির অধিকারী হবার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা—এই ভাবটি মানুষের মধ্যে এক এক সময় আসে।

তাই অবশ্য বিশেষ দেখেছি মানুষ কখনও ভূত প্রেতের পুজো করেছে, কখনও সাপের পুজো করেছে, পাথরের পুজো করেছে, গাছের পুজো করেছে, আরও অনেক রকম পুজো করেছে। এবং এই সব কিছুই—কলাপের মধ্যে মন করেছে যে তারা নূতন কিছু শক্তি পেয়েছে। আর একজন সাময়িকভাবে তারা অনান্ততও হয়েছে। পাপার্থ ধর্মশাস্ত্র, পাপার্থ ধর্মশাস্ত্র প্রাচীতিক—এরকম বর্ণনা বিশেষ করে চোখে পড়ে। কিন্তু ভারতের এসব ছাড়াও যা আছে তাকে বলা হয় সনাতন ধর্ম। সেই সনাতন ধর্মকে কি আমার ঐতিহ্যাসিক বলব? উৎক্ষেপের যুগ, আর্থিক বৈদিক যুগকে তে প্রাগৈতিহ্যাসিক যুগ বলতে হবে। সেখানে কিন্তু আমার এর একটি ভিন্ন পরিচয় পাই। সেই যুগের ভারতের মানুষ তার গবেষণা, তার সাধনা, তার সংগ্রাম, তার তপস্যা মধ্য দিয়ে এক তথ্যকে পেয়েছি, যে ততটুকু বেদে বার বার বলা হয়েছে—‘আমি তিনিই’, ‘আমি সেই পুষ্প’, ‘আমি সেই অনন্ত’—‘তত্ত্বসম’ ‘আহং ব্রহ্মাসি’। এই সব মহাত্মা তারা। আবিষ্কার করেছিলেন—উপাসকদের নিগড়ে বেঁধেছিলেন। এই পথে, এই পাওঁচাই পাওঁচাই পৃথিবী পুরুষের মাধ্যমে নন্দ যুগের সুখে একই একই বাইরের আর কিছুই নেই। এ কথা বৈদিক যুগ থেকে আমার। শুনতে পাইছি এবং
ভারতবর্ষে এই শুরু এখনও বাজায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসে সেই শুরু উচুতে তুলে ধরে বলে গোলন মানুষ ‘মান্ডস্ক’।

আলোচনা শুরু হয়েছিল ধর্ম নিয়ে। এই ধর্ম মানুষের সঙ্গে রয়েছে কেন? তার কারণ সব জিনিসেরই, সব বস্তুরই একটা ‘ধর্ম’ থাকে।

মানুষের স্বভাব কি? মানুষের ধর্ম নিজেকে জানা, ঠিক ঠিক নিজেকে বুঝতে পারা এবং নিজের যে লক্ষ্য, চরম লক্ষ্য—‘পরমার্থ’—সেই পরমার্থকে পাওয়া।

এই হল মন্দির-ধর্ম, মানুষের ধর্ম। এই ধর্ম গ্রাহন না হলে মানুষের কথনও তৃপ্তি হতে পারে না, মানুষ চরিতার্থ বোধ করে না। আমার সেই যাত্রায় ও মন্দিরীর সম্বন্ধের কথা জানি।

সেখানে মন্দিরীর জিনিসসহ করিয়ে ছিলেন: ‘হে পতিদেব, তুমি যে উদ্দেশ্যে বনে যাচ্ছ, সমস্ত বিদ্রুপ, সমস্ত আমাকে দিয়ে, এগুলির মধ্যে আমি সেই উদ্দেশ্যে সেই তৃপ্তি খুঁজে পাব তে? ’ তখন উত্তরে তাকে বলতে হয়েছিল—
‘না, তা হবে না। এই হল অন্য জিনিস। ’ এটা এমন একটা জিনিস—

‘তদেহ প্রেম পুরুষ, প্রেমো। বিভাব্য প্রেমোং সর্বদানন্তরত্বং যদযমায়া। ’

(ঃ ১৪৭৮)।

অর্থাৎ, ‘এই আজা পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিভাব্য; হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতে প্রিয়তর; কারণ এই যে আজা, ইদি আন্তর্তম’।

আর আজা বাদের প্রিয় বলা হচ্ছে—তাকে কারা জান?

‘প্রমাণক ভবিষ্যৎ, যদি শোভিত’—এই সব প্রমাণক, আজ আছে কালেই, আজ থাকবে—কাল থাকবে না। বৈদিক যুগেই এই পরম সত্য আমরা লাভ করেছি।

ধর্ম বলতে ভারতের সনাতন ধর্মের এই যে নির্দেশনা—এই নির্দেশনাই আমাদের ঠিক ঠিক পথের নির্দেশনা।

আর একই যে জুস—ঋষিকুর যাকে বললেন ‘মান্ডস’—এই হল মানব ধর্ম, যেটা সর্বদা থাকবে।

কিন্তু পর ধর্মের ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের অনেক রূপ লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আচার্য এসেছেন, সত্ৰাণ্ত ধর্ম এসেছেন, তারা সত্য যেমন যেমন উপলব্ধি করেছেন, তেমন তেমন তারা বলেছেন।

তাদের অনুপালন ধর্ম, তারা আবার নিজেদের গুরুর কাছে যা শুনেছে এবং নিজেদের মনে যেটা ভাল লেগেছে, তাকে কেন্দ্র করে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছেন।

এভাবে সত্য দল তৈরি হয়েছে, নানা মত তৈরি হয়েছে, সত্য নানা গথ তৈরি হয়েছে। তাই আমার দেখতে পাই।

ভারতে সনাতন ধর্ম প্রাধান্যে প্রাণের, ‘শ্রীকৃষ্ণ’ ও ‘শ্রীকৃষ্ণ’।

শ্রীকৃষ্ণ যাপন যায় এক ধর্ম: সনাতন।

শ্রীকৃষ্ণের যে সত্য বলা আছে, সে সত্য এমনই সত্য, যে সত্য কখনও পরিবর্তিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ পায়ে যায়।

দেশ, যুগ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সেগুলি পরিবর্তিত হয়।

মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা, তার বিষয়নার দ্বারা শুভতি তৈরি করেন, রচনা করেন এবং তার নির্দেশনাতে চিনে থাকেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যা পাওয়া যায়, সে বিশেষ কখনও ভালবেলা চলে না। যে,

সেটি মানুষ চিন্তা করে তৈরি করেছে।

শ্রীকৃষ্ণ হারা, যে সত্য অনুসরণ হয় তাকে বলা হয় ‘Revelation’

সেই সত্য ‘একাকিত’ হয় পবিত্র, দৃষ্টি, অনুপাদিত মন।

ঠাকুর বলেছেন—‘হলুদ মনবুদ্ধির গোচর’।

‘মনসৈবেদনাত্র্বণ্য নেহ নানাস্ত্রী কিঙ্করা’। (কঠঃ ২১১১)।

মনের দ্বারাই এই কথা উপলব্ধ; এই ব্যাখ্যা অনুমাত্র ভেদ নাই। ঠাকুর এসে আরও পরিকার করে এখানে ধরণের দিতেছেন: ‘এই শুদ্ধ মনবুদ্ধি দিয়েছ হয়।’

‘মন তার’ মন বলছেন
श्रीरामकृष्ण। एहि ‘मन तेर’ हरें मन मध्ये शुद्ध हय, तयथ ते सेवा शुद्ध मन रुद्धि कौर आत्म हय। श्रृष्टितेऽधु या एकाशिण्य होल्य, सेवुलि श्रृष्टि कः। तेहि स्थिन परिवर्तनीय। किंतु स्थिति अभासण कर, श्रुतिक धरे आत्मके कतर रकम बादामवाद। इन्न समेत चोटी र राजद चलते निरंतर चक्रालिव।

गौड़या ये धर्मके तथा आलापित हल मानुके जन्म हर्ष प्रकाशम, नब सला पिये आत्म रकमले आवश्यक हरे पड्डॅ। तेन सेवा फळने होने वा धरम ‘एकटा’ बुधिगत विषास माखु।’

अनेकों के धारणा, देशेदश जीवन हर्ष यथार्थ प्रयुक्त हरे ना। किंतु ठाकुर बलीहे—दसाकती बलीहे, एटा अंतर्क्ष्य निकाल, एटा जीवन पेटे हरे, जीवन प्रतिफलित करते हरे—‘It is a practical affair’. इन दिककार यमन केन जोयल थाके ना, तेन नानाकरक गौराजम, अम्बात, आदर्श, मानागढळः—एचल्लाः जोयल बसेः। प्रकृत धर्मसूचि, धर्मरूप एवं तारी शृंखला धरे आयुबोधे जगरण घटते हरे। आत्म हरे वृत्त हारे ना। यदिने ए बिषये बार बार करे समस्त धर्मशृंखला सत्य दशकले खुर स्थापण करे सारे गोरे एवं शृंखले तार दासारकुर दिकके कार्यों बला हरे। श्रुतिभी एकसे कथा बला।

सर्व शासके मूलतः सकल धर्मशृंखला अवशुकिते कार्यों देखा यान ने तेने रहे कोण पार्श्वक आँचॅ। फलतः आत्म अनेक दर्शन, अनेक पुराण, अनेक तत्त्र, ‘पंक्राथ साहित्य’, ‘शैव आगम’, इत्यादि अनेक किंचि पोरे। भिन्न भिन्न पथोः पोरे। एकुण्डि मार्ग, निर्णय मार्ग—एहि सब पोरे। श्रेणे पथे, पोरे पथे एहि सबसे कथा उपनिषद बलीहे, पुराण इत्यत्तिरे सर्वत्र एहि सब कथा बला हरे। किंतु सनातन धर्म कले आत्मे राखते हरे छटीत भुत। एकते ‘Divinity of man’—‘अंत्र एकाशी’। आयमे सेव पूर्ण, आयमे हो आत्मा एवं अपराधित ‘शुक्ल राजामद्य किंप’ (ईश उँच १), ‘Immanence of God’ ईशर सर्वत्र आत्मे। बलवृत आत्म, आत्म बलवृत, ईशर बलवृत, वा मने लागे। किंतु परमार्थे से सत्य, सेटि सर्वांश्यूष्ट। तेहि सत्यके धरते हरे। ध्याने आत्मा अबतारकर मने करि, ईशवृत मने करि, साक्षां ईशर मने करि वा साधिसपा महापुरुष बलि वा विशिष्टजै मलिवाय। तराई एहि तय हृदे जोने एवं जानिये। सनातन धर्म हिसेबे एहि हृदे महत हरे आत्मा पोरे, नाइसे तरे एक लाके तायोः याहे ना। नाइसे ततके अध्येते दाराय आयत्त करते हरे। कतर रकम मिलि सत्य राखे, मिलि तराई—सेवुकिबे दूर करते हरे। आत्मा मुख्य हरे चाई, आयत हरे चाई। आत्मा सदानंदभूत हरे चाई, आत्मा सदा चतुर्थ हरे चाई। आत्मा हरे चतुर्थ करों वाहित ना। हरे—एहि आत्मा चाई। एर जग्य आत्मा के करते हरे। आत्मा एने सेवहे आत्मा तथा आत्मा सोपान आरोहणे याय एहि एकके एकके हे एहि रेते हरे। तेने येहे तृणाय, सेवुकिबे आत्मा दिते हरे, एवं सेवहे ही साधन, भजन, ताग, तपता इत्यादि कथा समस्त शात्रे बला आँचॅ।

आत्मा हे आलोचा विषये येहूः “श्रीरामकृष्णः” एक नृतन धर्में प्रज्ञान, सेवूः प्रेममें आत्मा ऊँचे हे चकके हे बल पहे धर्म हारे कि? काईमे बली धर्मरूप
বলে আমাকে চিনতে হয়,—আমি কি দেখে চিনব?
একজন অনেক ঠাকুর দিয়েছেন, একজন পড়বাদ পরেছেন, তিল কেটেছেন, ধর্মশালা করে দিয়েছেন, সাধারণ ভাবার দিয়েছেন, তিনি যে বিশ্ব ধর্মান্তর নয় নিশ্চয়ই নয়। এ বিষয়ে নিষ্ঠায় হতে গেলে সমাজে ধর্মের উক্তিটি দেওয়া অ্যাওয়েজন।
মন্ত্র বলছেন :

“এক এবং সুরস্মরণে নিন্দেনপূর্ণতাতে যাই।
শরীরের সাক্ষাৎ সর্বমৃদ্ধি প্রকৃতি।”
( মহাভারত, ৮.১৭ )

‘এক এবং সুরস্মরণে’—এই একটি সুখী, এই একজন থাকবে। সে কে? আমার যেটি ভ্রাতাভিক ধর্ম যেটি আমার ঘন ধর্ম, সেইটি আমার সঙ্গে থাকবে।
সেই—’এক এবং সুরস্মরণে নিন্দেনপূর্ণতাতে যাই’, মনে গেলেও আমার যেটি নিজস্ব ধর্ম, সেটি আমার সঙ্গে থাকবে। আর কেউ থাকে না। এটি
মন্ত্র কথা। মন্ত্র আরও পরিচয় দিয়েছেন, ধর্মের
অভাবে দেখা যাবে—

“ধৃতিঃ কফমা দমোঘট্টেতে সৌচমিত্রিয়নিষ্ঠেতে।
ধীরিত্তা সত্যমক্রোধে দশকং ধর্মক্ষমেতে।”
( মহাভারত, ৬.৯২ )

বামী বলছেন : ধর্ম—জীবনে পরিণত
কর্মবাচক বন্ধ, ধর্ম অনুমু তুর্ন বন্ধ।” ৫

আবার স্রীপ্রভাত আই প্রসঙ্গ বলছেন : ‘শিং
বেঙ্গল না, কি হবে?’ আবার বৌদ্ধবুদ্ধের কথা:
‘মানবস’ হবে। আমার সঙ্গে অন্যতম জীবের কি
তারতম? যদি না ধৃতিঃ কফমা, সঙ্গম, মন্ত্র, সৌচমূঢ়া, ইক্ষুয়াম্যরক্তিতে না থাকে, আমার যদি ইক্ষুয়াম্যরক্তিতে সাপে থাকে, আমার অকস্মা-সঝোঞ্চায়, বাহির-ইক্ষুয়াম্যরক্তিতে 

ুপর যদি সাপে থাকে, যদি সত্যাদিত্যে না থাকে, আমি যদি কৃষ্ণের চোখে হয়ে থাকি, আমায় যদি ঠিক ঠিক বিচার—“সা বিচার বা বিমুক্তবর”—মূঢ় ব্যাপার যদি কোথায় দেখা যায়, সেই বিচারের সঙ্গে যদি সম্পর্ক
না থাকে, আমি যদি ( বী না বোধ না থাকে, তবে আমি আর কিনের মায়ে? মায়ের মধ্যে যখন
শুকনো হয়ে যাবে, যখন তার ভিতর দেখত
প্রাকাশ হয়ে, তখন সেই মায়ের দেখতা, তত

হয়ে যাবে। তখন সে ‘আঘাত রক্ষোঁ’।

মহাভারত এই ধর্মের পরিচয় দিয়েছেন :

“প্রভাবায় মনু-যাম ধর্মবিভাগ কৃত্তম।
য় না যাতে প্রত্যব্যবস্থান স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।”
( মহাভারত, ১০.৬৩১০ )

‘প্রভাবায় মনু-যায়া ধর্মবিভাগ কৃত্তম’ যাতে
‘না যাতে প্রত্যব্যবস্থান স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।’

( মহাভারত, ১০.৬৩১০ )

এই বে চারিদিকে এত অশাপ্ত, তার কারণ
‘ন তু প্রত্যব্যবস্থান, ন তু ধর্মবিভাগ’ মায়ের
বে মায়ের, মায়ের বে বুঝে, সেই মায়ের তাত
স্থানের মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। নোনাটা ছি‌ড়ে
গেছে। সে অঙ্গ দিকে দোঁড়াচ্ছে। বিষাদ বিষাদ
স্বপে কোরো হচ্ছে। আর মায়ের সেই যে পিছনে
ছেলে হয়ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে এত অত্যন্ত,
এত অপারাজিত। কিছু ধর্ম যদি তাকে ধরে রাখে
—‘ধর্মে রক্ষতি রক্তত’—তবে সে রক্ত পাবে।

ভাববেও একই কথা সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে।
নাদ বলছেন :
নতুন ভাগবতেজ্জয় লোকান্ত ধর্মসেবাে বে।
বক্ষে সনাতন ধর্ম নানারুষমাত্মাদুত্তমু তুমি।

(ভাঙ্গেত, ৭১১১৫)

সনাতন ধর্মের কথা বলছি, শোন। কেন থেকে শুনেছি? নারায়ণ-মূৰ্ত্তি শ্রুতি—নারায়ণের কাছ থেকে শুনেছি। তিরিশশটি ধর্মের লক্ষণ বলেন তিনি। তার মধ্যে এ পটুবস্ত, তিলক, ভৈরবা, দান ইত্যাদির কথা কিছু নেই।

ভাগবতের গোড়ার কথা ‘সত্য পরাণ ধীরার’।
মানুষের ধর্ম সবচেয়ে বড় কথা সত্য। ঠাকুরের কেন্দ্রে আমরা দেখছি, ঠাকুর মার পাদপদ্ধ সব অর্পন করেও সত্যকে দিতে পারেননি। এটি পারা গেল না। সত্যকে ছাড়া গেল না।

“সত্য দয়া তপঃ পৌচঃ ততিতিতে শিবো ধর্ম।
অহিংসা প্রকচ্ছর চ ত্যাগে বাধায় আর্জর্মু।”

(ভাঙ্গেত, ৭১১১৮)

নরমাত্রের সাধারণ ধর্ম কি? সত্য, দয়া,
তপস্যা, পৌচা, ততিতিত, যুক্তায়ুক্ত বিবেক, শম,
দম, দান, বাধায় ও আর্জর্মু।

এটা করে এটা পাও। এটা করে এটা পাও—এই যে বিকর্দন— যাচাইর বাহায়—
‘Trade’। এক জোড়া। পাঠা দেব কালীদাঙ্গে।
মালায় ঠিক জিতব। এ তো আমরা হরদম
করি। এটা ধর্ম হচ্ছে না। ভাগবতকার

মন্ত্রাঢিক ছিলেন, মনোবিভ্র্যান্ত জানতেন। তাই
বলেছেন—‘গ্রাম্যেহোপবর্ম শেষন’—এই যে গ্রাম
‘ঈশ্ব’ ত্যাগ করের, আমরা এখন গণতন্ত্র, সমাজ,
সামাজদের কথা বল। ভাগবতকারও সামাজাল,
সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। আমরার
সাবিভগো ভূতেভাষা যথাধিক। (ভাঙ্গেত, ৭১১১১০)
একলা একলা থাক, তা নয়। ‘যথাযোগ্য’ ‘যথাধিক’
যেমন প্রয়োজন সে রকম ব্যক্তিদের করে আমরা
এই করব।

এবং চৈতন্তচরিতামৃতের কথা উল্লেখ করব।
চৈতন্তচরিতামৃতকার শ্রীমদ্ভাগবতের তিরিশটি
লক্ষণ না বলে একটি কম করে বলেছেন। চারটি
বোধ হয় বাদ দিয়েছেন। কিন্তু মৌলিক সব এসে
গেছে। চৈতন্তচরিতামৃত থেকে উক্তি দিয়ে
বলছি।

“কৃপালু, অকুতোদৃষ্ট, সত্যসার, নম,
নির্দোষ, বদায়, মুচ্ছ, শুচি, অফিকন।
সরোপকারক, শান্ত, কুলকেশ্বরণ;
অকাম, অনীহী, স্বৰূপ, বিজ্ঞ-বৃহৎগুল।
মিলাদু, অক্রমত, মানদ, অমানী,
গাত্রী, করুণ, মেঠা, কবি, দক্ষ, মৌলী।”

(শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, জগদ্ধাত্রী শিক্ষা সংস্পর্শে
মধ্যলীলা, ২২শ পরিশেষ, পৃষ্ঠা—৫০২)

[উদ্ধৃতন পরিকল্পনা নোট]

---

2. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পর্ব ছয় (১০৮০), পৃষ্ঠা ১০৫
মানুষের কথা
অধ্যুষিত বিষয়ছান্দজী

নির্দেশনা নিত্যমন্ত্রগণ ভক্তানামকাপাদ্বিতিবিশ্বে সৈ।
ঈশ্বরতাপরমেশ্বরীদাম্যৎ রামকৃষ্ণ শিবসু নমা।
জননী সারদার দেবী রামকৃষ্ণ জগদ্ভূর।
পাদপথে তেজঃ শির্ষা প্রসাদমামি মূর্তমূর্তি।

আজ শ্রীরামের সম্বন্ধে করেকটি কথা তামার
দের বলবো। তাকে কতকাতৃ বা বুখতে পেরেছি।
ভগবান শঙ্করাচার্য তার গীতাভাষায় লিখেছেন, অতিরতার
পুরুষরাও হরহ মানুষের মতো লীলা করেন; তবে
তুমি নিজেদের কোনা প্রয়়োজন সিদ্ধির জন্য নয়,
জগতের কলাপের তৌলে তুরা মানুষের মতো অচরণ
করেন। তারা নিজেদের শরীরকে পর্যন্ত লোকহিয়াতে
আজুতি দিয়ে থাকেন।

ঠাকুরের বিনা আমলে, কেশব সেনের কলুটোলার
বাড়িতে ছুটে গিলিন্দ। কেশবের মৃত্তি বাড়ি ছিলো
না। ঠাকুরের পরবর্তী হাটে নিয়ে বেলাঘরেতে তার
সঙ্গে দেখা করতে গেলন। কেশবের বাড়িতে এই
বেলাগুলো তার পিছনে ঠাকুরের নিজের কোনো
সার্থ ছিল না; টাকুয়ার যাত্যাত তাকে কিছু
দেবীরে যত। কেশবের অমৃতের সময় ঠাকুরের সিদ্ধে-সরীকে ভাবিত মেনেছিলো, যো শ্রীমানজনের
সার্থক করে খালো। ঠাকুর শামিতা প্রবেকন্দ্রে
কোনা ভালোবাসতেন। তার অহেক্কী ভালোবাসা।
সে ভালোবাসার আশ্রয় যারা পেয়েছে তাদের
জীবনের ধারা বদলে গেছে। সে আহ্বাদ মুখে ব্যক্ত
করা যায় না। এই পৃথিবীতে অন্য ভক্তের গীতিপথে ব্রাহ্মণের বললেছিল, —“ঠাকুর
আমাকে দেবতা করে দিয়ে গেছেন। তিরঙ্কা বা
ভর্মনার ভিতর দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে।”

জীবনের প্রথম এই অহেক্কী ভালোবাসা
আবাদন করেছি শ্রীমার কাছে। তার অপার সেহ-লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। সংসারের জননীর
একমাত্র পুত্রপুত্রে আদরয়ে পালিত হয়েছিল ভর্মনার
গর্ভধারিণীর ভালোবাসায় তখন প্রেমের ব্যথ করতাম।
শ্রীমার সার্থকে এসে সে ভালোবাসা আলুরুণ
লেগেছিল।

পৃথিবীতে হতে চলাতে জয়রামগাতিতে শ্রীমার
প্রথম দর্শন লাভ করি। তখন ১৯০৫ কি ১৯০৬
সালে। আমার বয়স লাখ-উনিশ। কলকাতার
ছেলে পল্লীগ্রামে চলা হয়েছিল। ভাবনা হলো কে
শ্রীমার কাছে পরিচয় করিয়ে দেবে। মনে একটু
সকিন্ন ব্যথ করেছিল। যখন তার সামনে গিয়ে
ডাক্তালাম, মা তরকারী কুটিলিল। আমার দেখেই

ঢিং ঢিং ঢিং, শ্রীরামকৃষ্ণ মাঠ ও মিশন।
বললেন, “কেমন আছ বাবা? রাস্তায় আসতে কোনো কষ্ট হয় নি তো?” সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি। বাবা! এ কি একটি আমার জীবনে সেটি একটি স্মরণীয় দিন। সে দিনটির কথা ভাবলে অশ্রু সংরক্ষণ করতে পারি না। সেদের মার কাছে সাত দিন ছিলাম। কত মেহে করেছিলাম। কত সন্ত্ক্রমিত কথা বলেছিলাম। তিনি তখন ভাব-সমাধি করিয়ে দিলেন না। চিরকালের মতো সন্তান বলে গ্রহণ করে দিলেন।

উদযাদের একদিন পূর্ববর্তী একটি মেয়েকে মা দীন্ধ দিলেন। দীন্ধ পর তার সঙ্গে একজন আহার করলেন। পরে তার হাতে একটি জল তুলে দিয়ে মা বললেন,—“হাত থেকো।” হাত থেকায় হলে তাকে আর একটি জল দিয়ে মা বললেন—“পা থেকো।” মেয়েটি তে কেঁদে ফেললে। বললেন এমন আদেশ মা যেমন করেন। মা বললেন—“হুমি আমার কে?” সে উঠে দিলে,—“আমি তোমার মেয়ে।” তখন মা বললেন—“তবে যা বললি শোনা। পা থেকো।” তখন সে পা খুলো।

জয়ন্তীরামবাঙ্গলে একদিন একজন মুসল্লিম মর্যাদারের রয়ালকে খেতে বসেছে। পঞ্জিকা বছর আগের পশ্চিমাঞ্চলের নিষ্ঠুর শ্রেষ্ঠপরিবারের কথা বলছি। প্রসন্নামায় মেয়ের নলিনী উঠোন থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেই মজুরকে খেতে দিচ্ছিলেন। মা একটি কি কাজে কাটেছিল। ব্যাপারটিতে তার জ্ঞানের প্রতিটিতে তিনি ও কি বলতে হলে নলিনীর হাত থেকে তা কেঁদে নিলেন। কাছের বলে বারা খাও বলে পারিপাটির করে লেকটিকে খাওয়ালেন। তারপর এটা পরিধান করে মা গোবরজল ছড়া দিচ্ছেন, এমন সময় নলিনী বললেন, “পিসীমা, তোমার জাত যাবে যে!”

মা বললেন,—“ছেলের এটা পরিধান করলে জাত যায় না কি!”

নিবেদিতা তো মেম ছিলেন। মা তার ভাব জানতেন না। অথচ নিবেদিতার সঙ্গে একজন খেতে বসতেন। তার কি উদারতার। এই সব দৃঢ়তায় আলোচনা করলে তোমরা দেখে পাবে মা ভালোবাসা কি অন্তরীক। এই ভালোবাসা দিয়েছিলেন তিনি সকলের মা হতে পেরেছিলেন।

১৯১১ সালে দক্ষিণ দেশে গিয়ে মা ব্যাঙ্গলোরে এক সমাধি ছিলেন। সেই দিনগুলির কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ঠাকুরের তখন এতে একচার হয় নি। মা আরো দেখতে এসেছেন। কথা কাছে হীরে। এই সাত দিন মহিলোর দিকের দিকে থেকে আরাম পেতে গরিব দুঃখী পর্যন্ত কত লোক যে আশ্রমে ছিলেন তার লক্ষ্য নেই। না যেতে আসে প্রাণের দর্শন বহে যেতে সুর্য একটি ঘরে। তার অবস্থার দর্শন জানেন না বলে তার খুবই কষ্ট হতো।...আমরা ও দিকে এত দিন থেকেও ভাব শিখতে পারি নি।

ব্যাঙ্গলোরে একদিন আড়াইতে তিনটাটে মাকে ফিটনে বেড়াতে নিয়ে গিচালাম। সেই সময় আশ্রমের ভীড় ছিল না। কাছেই গোবিন্দের ওহে-মনির দর্শন করে আমরা যখন আশ্রমে ফিরলাম, তখন সেখানে লোকে লোকারণ্য। মাকে বললাম,—“দেখুন এত লোক দর্শনের জন্য এসেছে।” মা গাড়ী থেকে নামলেন। তার পায়ে বাহ ছিল, একটি নেমে চলতেন। মাকে দেখে দর্শনার্থী জন্য। দক্ষিণ দেশে প্রচলিত রীতি অনুসারী সাহায্য প্রাপ্ত করলেন। মা অন্য সমাধি থাকে বলার মতো মুদ্রিতে দাবিদে।
থাকলেন। তাঁর বাহাগান ছিল না। আমার ভয় হয়েছিল পাছে পড়ে যান। সেদিন তিনি সকলের হয়ে পুলকে ভরিয়ে দিছিলেন। মা বুঝিতা হলে দশমাক্ষিরা। আনন্দ করতে করতে চলে গেলেন। একজন বললেন,—“পূর্ব তো দেবী, আমাদের সতিয়কার মা।”

একদিন আশ্চর্যে এক ঘর লোক বসে। ক্রিশ-চলিয়ে জন। মা আমাকে বললেন,—“বাবা, এদেশের ভাষা আমি নাই। একটা কথা বলতে পারছি না।” আমি তাঁদের সে কথা জানালাম। তাঁরা বললেন,—“আমাদের পাণ্ডামাতৃদেবনে আজ আনন্দে তরপুর হয়ে গেছে। কথা নাই বাবা বললেন।” মা হাত তুলে তাঁদের আশীর্বাদ করলেন।

মার তো। তবু ঠাকুরের মতো মুক্তমুখী। সমধি হতে না। ঠাকুর স্পষ্টমাত্রই লোকের কুলকণালিনী জাগিয়ে দিতে পারতেন। মা এমনিতেই এতে। আজ তাঁকে মুখে জগতে তোলপাড় হচ্ছে। এই সেদিন কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে মারের-ভুক্তকের প্রাকৃত সত্য হয়ে গেল।

* 

নারী ধর্মজগতে এক প্রাঙ্গলিকা। ভগবান বুদ্ধ, শ্রীশ্রী মহাপ্রভু, আচার্য শঙ্কর প্রমুখ অবতারদের জীবনে নারীর স্থান ছিল না। শ্রী ত্যাগ না করলে পরমার্থ লাভ হয় না,—এই তাঁদের ভাব। শিবায়ত শঙ্কর বললেন,—“মাতৃকের দায় কি? নারী।” সম্প্রতি তুলসীদাসের দীর্ঘ বললে নারীকে “দিন কি মোহিনী রাত কা বাঙ্গিনী” বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রামকৃষ্ণবং কিছু এমন নয়। ঠাকুরের জন্ম যখন পাতার সন্ধান চলছিল, তখন তিনি নিজেই বলেছিলেন, জয়রামবান্তে রাম মুখের বাড়ীতে পাতার কৃষ্টাভ্য হয়ে আছে। শ্রীমান ঠাকুরের সেই “কৃষ্টাভ্য” মেয়ে—সাফাং জগদীশ। ঠাকুর অমন কাজিকে এই হণ করলেন না। চিহ্নিত মেয়েটিকে নিয়ে সংসার-রহমতে তিনি যে আত্ম লীলা, যে নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন জগতের ইতিহাসে তাঁর নিজের মেলে না।

* 

কৌরব সভায় হোঁপলী যখন লাগিতা হন, বুঝিতে তখন সত্যবদ্ধ; তাই পাওবে ছিলেন নিক্ষিপ্ত। সতির বেদনায় ভগবান স্রীকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা দখল করিয়ে প্রকাশিয়ে দিলেন। ‘ব্যাঙ্গং সমস্তাং সকলান জগৎসু।’ ঠাকুর এবং স্মারকীর সম্প্রতি দেখেছিলেন নারীজাতি না জগতে দেখে উন্নতি হবে না। সত্যসংস্কার স্মারকীর একটি ব্যাঙ্গং প্রকাশিয়ে পরিকল্পনা ছিল। তদ্ভবানী স্মারকের জন্য গঠন পূর্ব পারে জমি কেনা হয়েছে। শ্রীমান শতবর্ষ জয়স্ত্রী হলন। ১৯৩৩ সালে। দশ বছর পরে ১৯৩৩ সালে স্মারকীর শতবর্ষ জয়স্ত্রী হবে। তার পূর্বই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর স্মারকের পরিকল্পনা। সেখানে সমন্তসিনিরা থাকবেন। তার সঙ্গে বর্তমান মাতের কোনো সন্ধ্যা থাকবে না। একদা আমার মাতার মাথায় বোধিশী জানে পূজা করে ঠাকুর রক্ষকৃপ্তনীকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। তারপর আমার মেয়ের গাছারের আর্টীভাব হবে। সমস্ত নারীজাতির ভিতর মাতৃভাবের উদ্দেশ্যে—বোধিশী পূজার ইহাই গুচ্ছ।

এখন ঠাকুর ও মারের যুগ। আমাদের সেই-ভাবে জীবন গঠন করতে হবে। (সমাজে মাতৃ-মওলীককে লক্ষ্য করে) তোমাদের চেয়ে মা কম সংসার ছিলেন না। সংসারের মধ্যে যেকিনী তোমাদের আত্মজাতির জীবন গঠন করতে হবে তাকে আদর্শ রেখে।
মার একটি উপদেশ আমি প্রত্যেকে চিন্তা করি।
লীলার সবরের চারপাশ দিন আগে তিনি অমৃত্যুর মা নামে আসম মাতৃবিয়োগে শোকাকুল। একটি ভক্ত্যন্ত্রে বলেছিলেন, “যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখে না, দোষ দেখে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় না, জগৎ তোমার।” নিমগ্নের সবই তত্ত্ব। কিন্তু মৌমাছি নিমফ্লু থেকেও একটি মধু আহরণ করে নিয়ে যায়। তেমনি, সংসারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক রয়েছে রঙে, কিন্তু সকলেই মায়ের সম্ভাবন। প্রত্যেকের মধ্যে একই ঈশ্বরীয় সত্তা বর্তমান বলে সকলকেই আপনার জন্ম করতে হবে।
মার এই অন্তিম উপদেশটি পালন করলে তোমাদের জীবন মনোনয় হয়ে যাবে।

পৃষ্ঠাপাদ মহারাজ ১৯৪২ তারিখে মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীমান শ্রীমান সদরে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রকাশ বিদ্যাধর শ্রীমল কুমার ভট্টাচার্য বক্তৃতাটি ফাইলস্টের শ্রীমান ভ্রমণের ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সেই লিপিটি এখানে মুল্যিত হলো। —‘শ্রীকৃষ্ণের’ সৌজন্যে
‘Education is the manifestation of perfection already in man’

—Swami Vivekananda
Srimat Swami Brahmanandaji Maharaj
1st President,
Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission
শাস্ত্র বলেন: ‘দেবো ভূমি দেবঃ যজ্ঞেত।’ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনতরগ লীল। সহচর ও তার মধ্যে বন্ধনহীন কোনো বিদেশে নেই।

“Those who have seen the son have seen the Father and my Father in Heaven are one.”

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছা ছিল যে তাঁর কাছে তাঁই, শৃঙ্খলা তত্ত্ব ছেলে আনুষ্ঠানিক। ভগ্নাবহ আশার দিব ছিল। মাত্র আসামের কথা ছিল, “ভয় নাই, বাচ্চা, শৃঙ্খলাতে তুমি আসো তুমি।” রাখালচন্দ্র আসার কায় আগে তিনি একটি বালককে সহস্রা শ্রীরামকৃষ্ণের কোলে বসিয়ে দিলেন, “এই তোমার পুত্রের।” অবশ্য সাধারণ সংসারী জনের ছেলে নয়; তাঁই মানসপূর্ত।

রাখালচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “রাখালের রাজ বুঝি, একটি রাজ্য চালাতে পারে।” তদবধি তিনি রাজা—The greatest Constructive genius.

এহেন বাকির সম্বন্ধে কিছু বলা যা লেখা আমাদের মতন অজ্ঞাত কোনো ভেসা বেঁধে সাগর পাতি দেবার মতন। তবু তাঁরা কুঠি করে আশ্রয় দিয়েছিল, এই ভরসা। রাখালচন্দ্রের জন্ম ছিল মুলি শ্রীরামকৃষ্ণের কুলে। বালা স্থানীয় ধাতীর মতন ইন্দ্রিয়ী সাহায্যে তাঁর সাহায্যে। তিনি বললে মানসপূর্ত হলেও তাঁর বিশ্বাস তাঁকে বর্ণ বাস্তব-ব্যক্ত করতেন।

কোলকাতায় লেখা পাড়ার জন্য এসে তিনি ঘটনাচক্রে নরমন্দনাথ প্রামুখ শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচরদের সঙ্গে মিলিত হন। এবং তাদের মধ্যে অপূর্ব গ্রেমের বন্ধন গড়ে ওঠে। এই সময়ে মহামায়া কেশবচন্দ্রের অভাব যুবসমাজে বিশেষ আলোড়নের মূল্য করে। নরমন্দ-নাথ প্রামুখ সরাই কেশবের সমাজে অশ্রুতার পত্রে দায়িত্ব করে তাঁর সাহায্যে অশ্রুত হন। রাখাল-চন্দ্রও বাদ যাননি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন—নদীতে একটি প্রকৃতক কমল, তাতে শ্রীকৃষ্ণ দাড়িয়ে এবং তাঁর হাত ধরে একটি ছেলে নাচে। রাখালচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসা মায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে ছিলেন এই সেই ব্যক্তি।

পালে ছেলে সমস্ত হয়ে যায় এই তের পিতা আনন্দমোহন তাঁর বিরে ব্যবসা করলেন। কিন্তু এই বিরেই কাল হল তাঁর কি। ঠাকুরের পরম তত্ত্ব কোলগরের মনমোহনের ভগিনী শ্রীমানী বিশেষের সঙ্গে রাখালচন্দ্র বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু সাহসের বন্ধন টিকল না। মনমোহনের জননী তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ পদপ্রাপ্তে উপস্থিত করলেন। তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রাখালচন্দ্রের অবিবাহ লীলাবিলাস চলল—যেন কিছুই বাকি আর মা। কখনও কালে চড়ছেন, কখনও স্থান পান করতেন।

শুধু তাঁ নয়, উত্তরকালে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সোনবিনয়র হবেন যাতে শ্রীরামকৃষ্ণের অপর বিগত
রুপে ধর্মস্বাভাবিক কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে, তার জীবনের সাধনে তপস্যাই যে একান্তভাবেই প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণের তার প্রত্যেকটি অন্তর্ভাগ লীলাসহচরের ভাব বুঝে তাকে সেই ভাবে সাধন ভুঁজের উপদেশ করতেন এবং সকলের মধ্যে একটা অনেক প্রেমের বন্ধন শৃঙ্খল করে ভবিষ্যতের ভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে লীলা সম্প্রদায় করতেন। সকলজনের শিষ্যতার বিষয়ে আকৃষ্ট, তাকে পাবার জন্য আমার কঠিন তপস্থাত্মায় ব্যতীত হলেন। রাখালচন্দ্র বহু জলারাজ তপস্থানে করে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শন ধর্মস্বাভাবিক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন।

ইতিমধ্যে পাশাপাশি যামী বিবেকানন্দের অনুকূলে বিজয়ীনী উঠল। ডাক এই সকলের গড়তে হবে। অবশ্য কাশিরাজের মঠের সুচনা। তারপরে বরাহল ও আলমবাজার। তাই সময় কঠিন তপস্যার জীবন এরা সকলেই যাপন করতেন। শ্রীমান রামকৃষ্ণনন্দী মাহারাজ করে ঠাকুরের সেবা প্রাপ্তির দাতা। এরা সব সাধন সুচনা হিসাবে। শিশু মহারাজের প্রস্তাবক করে চারটি সিদ্ধান্ত তাত ঠাকুরকে নিষেধে করে জেলাপাকাতেন। আর ভুঁজে সাধনে উদ্দেশ্য-শূলাইতের জোর করে ধরে একটি মুখ পূর্বে দিতেন। পরম পরিবর্তনেতে এরা বলতেন—“ভাই শিশু, এই অনুভূত তুমি কোথায় পেলে?”

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেনঃ “ফুল হলুডে ভমর এসে ভোঁটা।” বরাহলের তার আলমবাজারের মঠ স্থান। কিছু কিছু নূতনর আমাদানী হয়েছে। তপস্পীত, আশ্বত্তস্ত, রাজমহারাজ এদের মূল তিনি সাধু জীবন গঠনের ভাব মিললেন। কেননা তিনি যে বিষয়ের তান। তিনি আশ্বত্তস্ত হয়েই ভগ্নপূর্তি করে থাকতেন। তবে লোক শিক্ষার জন্য এবং রামকৃষ্ণ নিদিধ পথ কায়ে পরিপূর্ণায় সুযোগ মন্ত্রিত করার জন্যই কঠিন তপস্থায়। আবলম্বন করেছিলেন।

দিকিরাজের বীর বিবেকানন্দ দেশে ফিরতেন। আসমুম হিমাচল ভারতবর্ধে প্রচুর আলোড়ন। বিবেকানন্দ কোলকাতায় এসেছিলেন। আলমবাজার মঠের গোলার মালাহাত্রী রাজনীতিবিদ দুর্গাচন্দ্র। ইত্যা ঠাকুরের এস সা মালার দিগিরাজের গুরুভাইকে রূপান্তরিত করতেন। কিন্তু যামী নেমেই—“গুরুর গুরুপত্রুশী বলে প্রভাসনামীকে ভূমিষ্ঠ প্রাণ করেন। মহারাজো ‘জোটোপ্রাদুর সামগ্রিতা’ বলে পুরুষায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রাণ করেন। উভয়ের এই লীলাবিচার কে ব্যবহার করতেন?

আলমবাজারে থেকে ব্যবহারের পালায়নে মঠ স্থায়িত্ব করে। সেখানে থেকে মঠের নিজস্ব জীবন দেখানো করা, এটি চোখের করে সমবায় উপস্থিত করাই প্রাক্তন কাজ। অবশ্য সবচাইতে প্রাণ ও প্রধান ক্ষেত্র শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাপূজা যাতে অব্যাহত থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের প্রিয় নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন তাঁ ‘তুমি আমায় কাঁপে করে নিয়ে যেখানে। রাখবি সেখানেই পাওজরণ’। ব্যবহারের জয়ণা কেনা, মরো যেই ইতিবাচক সর্বই হল। কিন্তু ঠাকুর বসবেন কোথায়? একটি ঠাকুরের হল বাই সেখানে আরো কন্তুল। তবে শোনা যায় শ্রীমান হাতে কোড় করে থাকলেন। ‘আরো তুমি এখন এখানেই থাকো।’ পরে মন্দির হলে সেখানে গিয়ে বসবে।

ভারতবর্ধে স্বাধীনতার এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দেবের অনুর্ধ্ব দেবপালনের সময় মহারাজ রস্ট্রীর পরিকল্পনার সময় তার প্রিয় গুরুভাই। যামী বিষয়কা-
নন্দ (যিনি পূর্বাষ্ট্রে ইংরেজিতে ছিলেন) কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মনিলনের পরিকল্পনা হল এবং সেই সময় বিজ্ঞান মহারাজাকে স্মার্তিজীবি বলেছিল: ‘আমি তোমার থেকে দেখব।’ উত্তরকালে ১৯৩৮ সালে মনিলন প্রতিষ্ঠাতাদের দিন বিজ্ঞাননন্দিনী দেখেছিলেন যে, স্মার্তিজীবি, রাজামহারাজ অমৃত পূর্ববর্তী দিব্যগ্রামের দর্শন করছেন। স্বতরাং ‘আমরা দেই লীলা করেন গৌর রায়, কোন কোন ভাগবানে দেখিবারে পায়।’

এখানে মিথ্যা নয়।

স্মার্তিজীবি অদর্শন হল ১৯০২ সালে ৫৭ বছরে।

বিজ্ঞাননন্দিনী বলেছিলেন, ‘সামন্তে থেকে একটা হিমালয় পর্বত সরে গেল।’ বিরহে কাতর হলেও; কেননা তিনি পুণঞ্জুরিতি নির্দেশনানন্দিনীকে বলেছিলেন ‘আমাদের আরো বেশী হয়।’ আলোকিক আনন্দের ভাব বিহার যার দেয় তার বক্ত সিদ্ধান্ত আনার—

সাহস বুঝ বাই তিনি সঙ্গকে দৃষ্টি প্রিয় করার জন্য কাজে লেগে গেলেন, যেখানেই যেতেন একটা আনন্দের হাটবাজার বসে যেত। ভারতনারমস্ত তীর্থ দেখছেন।

ব্যাপক ধরে এসে তৈরিতে যে আধ্যাত্মিক ভাব না ছিল বাই আছে তার পুনর্জগারণি এবং ভাবের উদ্যোগ। কোথাও গোলমাল হয়েছে।

মহারাজের উপস্থিতিতেই সব মিটে যাচ্ছে।

বলুড়ম্লে শ্রীমৃষ্টিকুরের মাছ ভোগ হয় থাকে এবং সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তরা ওসাদ পান। স্মার্ত বিবেকানন্দ যখন এটা আবারিতন করেন। একবার দীর্ঘ সময়ের প্রবন্ধির কালে, কেননা তাকে অনেক সময়ের জন্য বাইরে থাকতে হত, মাত্র পরিচালকদের অন্যতমের প্রতিকাটা এই মাছ ওসাদ সাধু ব্রহ্মচারীরা খাওয়া বন্ধ করলেন।

মহারাজ ফিরে এসে সব শুনলেন এবং তাকে ডেকে বলেছিলেন: ‘এ স্মার্ত বিবেকানন্দের মাঠ, এখানে অন্যমত চলবে না। ঠেমার মাধ্যম অন্যমত করার ইচ্ছা হয় তে বাইরে গিয়ে করবার।

এইকথা ফলেছিল। ধীরে একাকী বলেছিলেন তাকে কিছুদিনের জন্য বাইরে থাকতে হয়েছিল। সকলদিকে তার ছিল প্রশ্ন দৃষ্টি।

কয়েকবছর ব্রহ্মচারীর বুদ্ধিবোধ সাধারণে যাবার প্রস্তাবে তিনি প্রথম রাজা হননি।

কেননা তখন সেখানে ভাত খেতে অভাব।

ছেলের ছবিতে ষে পেটপুরুষের খেতেও পারে না, এটি তার পক্ষে একাকীই অসহ্য। তাদের বুদ্ধিবোধ কথা শুনে,

বিশেষতঃ মহাশর কাদে ঘুম হচ্ছে। জেনে তিনি মহাশরের জন্য টাকা পাঠিয়েছিলেন। তবে তার।

লুমিয়ে বাইছে।

ছেলের সব নানান আরোগ্য কাজকর্ম ব্যস্ত

থাকেন, বিশ্বাসের কোনও ব্যবস্থা নেই। তাইতো তিনি ভুবনেশ্বরে মাঠ করেন—

পরিষ্ঠান সাধু ব্রহ্ম

চারীরাও এখানে বিশ্বাস করেন। হুবলে ঠাকুরের

প্রসাদ পাবে এবং মনের অনন্দে ধান ভজন করে এই উদ্দেশ্য। বার মাস ঠাকুর সেবার জন্য ফল

চাইতে; তাই তিনি বহুকাল ফল ও ফুলের গাছ

পাল। দিয়ে ভুবনেশ্বর মাঠে এমন সুরক্ষার করে

সাজালেন: ‘সে যে তপস্বী ব্যক্তি পাবে, আরে

সুনীল শিলামালা।’ আজও ভুবনেশ্বর সেই পূর্ণ

মৃত্যু বহন করে চলছে।

রাজা হো। তাই চালচরণ কথারার সবাই

রাজার মতন। মাদাম কালভের ঠাকুর দিয়ে চাল

কেনার প্রস্তাব করলেন মহাপুরুষ মহারাজ শিব

ঠাকুর। মহারাজ বললেন: ‘সে কি কথা, তারকদা?

নির্দিশ ঠাকুর। এদিও চাল কিনলে সে চালের ভাত

থেকে এইসব সাধুব্রহ্মচারীরা হজম করতে পারবে না।

স্তরাং এ ঠাকুর দিয়ে অন্যকাজ হবে।’ সকলেই
একবারে মহারাজের কথার যৌক্তিকতা সান্নে বীকার করে নিলেন। আর একজন কিছুদিন মাঠ থেকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মঠকে দিতে চাইলেন।

নিকো কুলান, হাভিড শুরু বাবুরাম মহারাজ এই কথা মহারাজের কাছে উথাপন করতেই মহারাজ মুচড়ি হেসে বললেনঃ “তাই তো বাবুরাম দা, সাধুদে অমুকের বৈরাগ্য হল, আর আমাদের কিনা বিষয় বুঝি।” করজোড়ে বাবুরাম মহারাজ বললেনঃ ‘আপনার হয়েছে, রাজা, আপনার হয়েছে ’। ঝড় কেটে গেল।

ভূবনেশ্বরের নিকটবর্তী, একটা জায়গা দেখিয়ে নির্বেদনকর্তৃকে রাজা মহারাজ বলেছিলেনঃ ‘সুরেন-বাবু (নির্বেদনকর্তৃ পূর্বশ্রেষ্ঠর নাম) এখানে একটা ইউনিভার্সিটি করতে পারে? ’ অশ্চর্যকথা সেইখানেই, on that identical site, ইউনিভার্সিটি হয়েছে।

বিদায়ী আশ্রমকে তিনি বড় তালবাসতেন।

এখানে ভালবাসে ১৯২০ সালের ২৪শে জুলাইতি এখানে এসেছিলেন। আধ্যাতিক জগতের মূর্তিমান রাজা, ভাববান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্গত লীলাসহচর ও মানসগুহ্যের সেই পদার্পণের যুগল আজও উজ্জল। তিনি বলেছিলেন—ধর্মের আশ্রম।

চেলদেরকে বলেছিলেন ধর্মিয়ালক। তাঁরাই সেই ধর্ম এবং সেই সম্পদের কোনো অবকাশ নাই।

তাঁর ও তাঁর অ্যাভািক গুরুহাতাদের চরণে আমাদের অসংখ্য প্রাণ। তাদের অমোঘ অশীর্বাদী আমাদের সকলের জীবনে সফল হোক। এই প্রথম জানিয়ে প্রাণ করছি।

‘কালিন্দী ফুলকলমে মাধবেন কৃষ্ণাদরতঃ।

ব্রহ্মানন্দ নমস্ত্বাম সদ্গুরবে লোকানায়কঃ’।
সহরে জল সরবরাহ

বর্তমান সময়ে যেকোন স্থানে লোকেরা একত্র হইয়া বাস করে, তথায় বিশুদ্ধ জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যে অত্যাবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। সহর কিংবা গ্রাম যখন স্থাপিত করা হয়, সেখানে নদী বা ঝরণা আছে বা অন্য বেশী খুঁড়িয়া জল পাওয়া যায়, এ প্রকার দেখিয়া উচিত হয়। স্থাপিত করা হয়। দেখা পাওয়া সেই জল যাহাতে প্রচুর এবং পরিমাণ ও বিদ্যুত থাকিতে পারে, অর্থাৎ কোন জৈব পদার্থ (organic matter) জলে সরাসরি ভাঙে না থাকে অথবা কোন বিদ্যুত পদার্থ মিশিত না থাকিতে পারে, ফ্যালার মারীভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি অতি তুচ্ছ অল্প গভীর কৃয়াও যদিও স্ববিধায়হীন স্থানে হয়, তাহা হইলে তাহাতে অতি সুদর জল দিতে পারে। ধর একটি পাহাড়ের তলায় এই কৃয়া স্থাপিত এবং পাহাড় হইতে মাটির মধ্যে দিয়া যে পরিকর জল চুয়াইয়া আসিতেছে, উহাই উপরের কৃয়ার মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। এই জন্ত কৃয়ার জল উৎকৃষ্ট। এবং একই পাহাড়ের কৃয়াও পাদের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। মনে কর, অন্তিমের একটি পাহাড় মর্যাদা জল আসিয়া পড়ে এবং সেই জল মাটির মধ্যে চুয়াইয়া কৃয়ায় আসে। এই স্থানে স্থাপিত কৃয়ার জল অতি দৃষ্ট। ধর এই কৃয়া একটি ঘরের নিকট না হইয়া সমস্ত সহরের জল সরবরাহ করে। এসন্ত কৃয়ার জল দ্বারা কত অনিষ্ঠ সাধিত হইতেছে, মনে করিয়া দেখ।

লোকেরা একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিলে সেখানকার মর্যাদা অপদার্ণ করিয়া অধুনিক ভাল ভাল এগালী যদি অবলম্বিত না হয়, তাহা হইলে সে স্থানে মর্যাদা কিয়াই মাটির মধ্যে চলিয়া যায় এবং কতক নিকটের নদীতে গিয়া পড়ে। এই একাকী কৃয়া বা নদীর জল খালাপ হইয়া যায় এবং সাধা- রণের সাহায্যে অনিষ্ঠ হয়। বিশেষতঃ দৃষ্টি জল ব্যবহার নিবন্ধন যে সব মারীভূত হয়, বিশ্বাসিকা ইত্যাদি হইয়া থাকে, এই কৃয়া বা নদীকে তাহার বীজ বলিয়া জানিও। কৃয়া চুয়াইয়া ব্যারামের বীজ মাটির মধ্যে দিয়া প্রবেশ করে ও নদীতে অপনানাপনি প্রবাহিত হইয়া যায়। লোকে বিশ্বাসিকা ব্যারামে ভাঙ্গার ভাঙ্কাল জানিয়া। অজ্ঞ পায় খরচ করিতে থাকেন, কিন্তু তাহার শীতাঙ্গের একাংশ খরচ করিয়া। মর্যাদা দূর করিবার চেষ্টা যদি করেন, তবে এই তীর্থ ব্যারাম কোন যে পালায় যায়, বলা যায়না।

ভারতবর্ষে বড় বড় সহর ব্যাপী, অত্যন্ত বেশী ভাঙ্গ জল কৃয়া হইতে প্রাপ্ত করা হয়; এবং এই কৃয়াগুলি সহর বা গ্রামের মধ্যে বা বাস্তবে স্থাপিত। প্রথম প্রথম এই কৃয়া সমুহের জল অতি উৎকৃষ্ট থাকে; তবে কিছু সময়ের পর সহরের মর্যাদা জল ক্রমে স্তর চুয়াইয়া কৃয়ার মধ্যে প্রবেশ করে এবং উহার জলকে আস্তে আস্তে অশান্তিকর করিয়া দেয়।

চতুর্ধ অধ্যায়, শ্রীমানমুন্ড মঠ ও মিশন।
যদি এমত হয় যে উপরের ময়লা জল কোন একটি অর্থে স্তরের মধ্য দিয়া যায় এবং তন্মিল্লন কোন ময়লার বীজ আর কৃষ্ণায় যাইতে না পারে, তাহা হইলে সে কৃষ্ণায় জল বর্ধবর্ধ উৎকৃষ্ট থাকে। তবে এ একার কৃষ্ণায় সংখ্যা বিশাল। সেই জন্যই তারত-বর্ষ সাহসিক মৃত্তিকাসংখ্যা হাজার করা ৩৪ হইয়া থাকে। অন্ততঃ স্থানে বুড়ির কাছাকাছি যায়। অর্থাৎ হাজার করা ১৪ জন লোককে মৃত্তিকায় মৃথ হইতে পেটে দোলা বুড়াইতে পারা যায়। ভারতের লোকসংখ্যা ২৮ কোটির বেশী (১৯০৫ খ্রীঃ); অতঃ-এব ১১,৭৬,০০০ লোক, ময়লা জল বায়ুহার নিবন্ধন ও তত্ত্বি বৎসরের মারা যাইতে চেষ্টা করে।

সেখানে আল্লা গভীর কৃষ্ণায় জল লোকে বায়ুহার করে, সেখানে সহরের নিম্ন লেভেলের দিককের লোকেই বেশী কষ্ট পায়। কৃষ্ণায় তাহা হইবে, বিস্মৃত হয় তাহা কম থাকিবে। নলীর জল যদি লোকে বায়ুহার করে, তবে নলীর নিম্ন লেভেলের দিকের লোকেরাই বেশী কষ্ট পায়।

জল ভাল মন বিচার ছাড়া আরও দেখিতে হইবে, জল যাহা পাওয়া যাইতে চেয়ে, তাহার পরিমাণ অল্প কি বেশী। কেন? সহরের লোকসংখ্যা ব্যাঘ্রিত থাকে, অনাবশ্বক বা উচ্চক্ষুদ্র হইতে পারে; তখন জল প্রচুর পরিমাণে অবশ্বক হইয়া থাকে। তখন বিশুদ্ধ জল পাইবার জন্য গভীর কৃষ্ণায় খনিতে হইবে বা দুর্বল হইতে কোন উপায় দ্বারা জল আনয়ন করিতে হইবে। অর্থাৎ ওয়াটার ওয়ার্কস করিতে হইবে। যথার্থ ওয়াটার ওয়ার্কস উন্নতিশীল শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮২০ খ্রীঃ অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে কাঠের নল ব্যবহার হইতে ছিল।

পূর্বে সাধারণ লোকের মধ্যে কেহ কেহ মিলিয়া এই কার্যের ভার লইয়াছিলেন এবং অনেক পরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন। একব্য কিন্তু ইহা মিউনিসিপ্যালিটির কার্য বলিয়া লোকের ধারণা হইতেছে। এতদ্বো তুলনাতে ব্যাপার, যাহার উপর লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাপ্তি নির্ভর করে, ইহা দুই একটি লোকের হতে রাখা ঠিক নহে। এবং বাস্তবিক ইহা হইতে লাভের আশা করাও মন্দিয়েক নহে। সাধারণ ভাল থাকিয়া, ইহা যে খৃষ্টিয়া না।

এমন “কত সত্যি আমরা জল পাইবে?” আমাদের এ প্রশ্ন হওয়া উচিত নহে। “অতি উচ্চ জল কোথায়, যাহা আমরা আমাদের সাধারণমাত্র পাওয়া দিয়া পাইতে পারি” ইহাই আমাদের প্রশ্ন হওয়া চাই। আর জল এই হওয়া চাই যে গৃহস্থরা প্রচুর পরিমাণে পাইতে পারে। কল কারখানা বা বাগান-বাটির জন্য জল যাহা দিতে হইবে তাহা সত্যি কথা। ইহাতে মিউনিসিপ্যালিটি অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। আরও একটি কথা স্বর্ণ জল হওয়ার দরপণ অর্থিয়ে দ্বারা যে সব দক্ষতা হইত, তাহা আর হইবে না। ইহাতে মিউনিসিপ্যালিটির দরদ্ধ লাভ হইতে পারে।

খুব সত্যি, জাপানের তথা যে সব দেশে আগ্নেয়ের ভয় অতি বেশী, যথা ওয়াটার ওয়ার্কস করিবার যে হরচ হইবে, তাহা কয়েক বৎসরের মধ্যেই—৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে উঠিয়া আসিবে।

বিশুদ্ধ জলের বন্দোবস্ত হইলে দেশের ক্ষার্তের উন্নতি আস্টে আস্টে দৃষ্টি হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে সংখ্যার বস্তু লোকেরা সহসা নলের জল ব্যবহার করিতে চায় না। আরও মসকে ভরিয়া জল
লইহাই উহা ব্যবহার করা ঠিক নহে। কারণ মসকণ্ডুলি অতি অপরিকার এবং উহার জল সেই জন্য বিষাক্ত হইয়া থাকে। বাটা বাটা ঝার নলের নল যথেষ্ট তঁহাই। যাওয়া হইবে। ততই ব্যাখ্যা উদাইত হইবে।

এক্ষেত্রে বড় বড় শহরে, কলিকাতায়, বোম্বায়, মায়াল, নলের জল ব্যবহার করিতে লোকের আর আপনি দেখা যায় না। এই সব স্থানে কলাম কখন কৃষির জল পানাহারের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে সাহসীর মতে কৃষির জল একটি বা বৈশিষ্ট্য কেই কৃষি পানাহার করা চুরিত না। যায়, তাহার জল পানাহারের জন্য ব্যবহার ঠিক নয়। এতে ইহাদের বিষাক্ত ক্রোধান্ত করা সেই সঙ্গে ফেলা ঠিক নয়।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বিগত জল বাহারে প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইতে পারে, তাহার বলে বলে বিশেষতর। ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, পুরাকালে বীজাপুরের লোকসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ ছিল। ইংরেজ ঐতিহ্যবিদ্যার জন্য বীজাপুর সহরের আধিপত্য অধিবাসী অধিবাসীর সংখ্যা। দশ লক্ষের কম ছিল না। বর্তমান সময় (১৯৫৫ খ্রীঃ) খাস কলিকাতা বা বোম্বাই সহরের লোকসংখ্যা দশ লক্ষ নহে। আদি-শাহী রাজারা এত বড় সহরের লোকায়তে যে রূপ জল বেগাইতেন, তখন তাহার। ধর্মান্ধ পাত্র। এই বিষয়ে একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন:

“সহরে ৪৫৩টি কূপ আছে বলিয়া শনা যায়; কিন্তু সে সময়ে জন্তুপ্রাপ্ত বিশাল করিতে হইলে, বীজাপুরের বোম্বাই অঞ্চলে অধিক লোকপূর্ণ ছিল, তখন টোর্বে (Torwe) জল প্রাপ্তি (ইহার সুরদের এক সাথে মাটির ৬৫০০ ফুট নীচত্ব) দ্বারা প্রধানতঃ জল সরবরাহ হইত। এই পরিবাহ (aqueduct) আফ্জল থা। কর্তৃক নিমিত্ত হইয়া” অমৃতবাদ—T. S. Hewett Acting Sanitary Commissioner, Oct. 17th 1875.

আহমদনগর ‘জলাহীন মর’ নহে বলে, কিন্তু ইহা সত্য যে এখানে জলের বড় অভাব ও কষ্ট। ইহা আহমদনগরের মসজিদ রাজগ্নি ভালের অমূল্য করিতে পরিয়াছিলেন বলিয়া তাহার। এই কষ্ট দূর করিতে অনেক ঘটনা করিয়াছিলেন। নিজামশাহী রাজার যে বেশি এই সময় জলের বেগাইতেন, তাহার যে সকল ধ্বংসবশেষ এখনও বর্তমান আছে, তাহার দেখিয়া তাহাদিগকে ধর্মান্ড না। দিরা থাকিয়ে পাটা যায় না।

আহমদনগরের মসজিদ রাজার জলরূপ মসকন্দুলিকে জলে জলমান করিয়া দিয়াছিলেন, এখন তাহাদিগের সেই সকল কীট বিপদের অবশ্য্যেও তাহাদিগের এরূপ বাস্ত্রের সাধা দিতেছে।

ভারতের অনেক মন্দিরের উপর পদ্ম অক্ষত আছে। তাহার এই প্রতীক হয় যে, এদেশবাসীর লোকের জন্য তিনিনের উপর বড়ই অশ্রু তুলিয়াছিল। ইহাদের জল চাহিল আর কোন জন্যোর বেশী অভাব এখানকে হইত না। ভারতবাসীরা পুরাকালে আফ্গান ফিরোজের ৩৫ বৎসর শাসনকালে জলসহ নিবারণের জন্য ইথনাদের বহ বহি বাস্ত্র দিয়াই থাকিয়া।

কর্তৃক দেশের হিন্দু রাজার যে সব উৎকৃষ্ট সহরের কাজ করিয়া। গিরিয়াছেন, তাহাদিগের আশ্রমাভিত্ত হইতে হয়। ১৪টি জলাশয় যে সমুদ্র কোট ঢাকা চর্চ হইয়াছিল। একটি সহর ৩২ খানি গ্রামে ১৮ মাস ধরিয়া চাষাবাসের জন্য জল সরবরাহ করিয়াছিল।

মায়াল অঞ্চলে কটন (Cotton) সাহেব পুরাকালের পৰ্য্যাপ্তার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া।

বলেন যে, উহারা পূর্বে বৈশিষ্ট্য জল দান করিত।
কোন কোনটি চতুর্থ কোন কোনটি দুর্গণ ইত্যাদি জলদান করিত। এই সব জলাশয় ও পরিপ্রেক্ষাপট সংখ্যা দেখিয়াও বোধ হয় যে পুরাকালে প্রধান ১৪টি জেলাতে যে সব পরিপ্রেক্ষাপট ছিল, তাহার মধ্যে একাংশে অনুমান ৪৩,০০০ জলাশয়ের মেরামত আছে, আর ১০,০০০ বেচেরামৎ আছে। এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বিশাল জলের অবস্থাক লোকে পুরাকাল হইতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া আসিয়াছে। এ বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান যাহাতে অবাসের সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে, তাহার জন্য বাণীকের চেষ্টা করা অবশ্যক।

প্রথম মঃ শ্রীশাম বিজানানন্দ্রী মহারাজ কর্তৃক রচিত 'রণ সরবরাহের কারখানা' নামক পুস্তক হইতে গৃহীত। পুস্তকপাঠার প্রকাশক বাংলা ২৩১২ সাল। বাঙ্গালী ভাষায় লিখিত কবিতাগী বিষয়ে প্রচুর ওষুধ মাইনামধ্যে ইহা অত্যন্ত। তাই রণসুর হয় প্রথম এখানে বিশেষ প্রানী রূপে প্রকাশিত হইতেছে। পূর্বায় শ্রীমান একজন (সিভিল) ইহীনীয়ার ছিলেন এবং সরাসরি হোমের পূর্বে ভারত সরকারের ডিপ্টি ইহীনীয়ার দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সাম্বু বিবেকানন্দের দর্শনের তিনি বেলোড় মঠ শ্রীরামকুণ্ড মন্দিরের প্ল্যান (plan) প্রস্তুত করেন এবং তাহারই তত্ত্ববধানে উক্ত মন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। পরবর্তীকালে তিনি মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষের অধিপতন অল্পকালকার করিয়াছিলেন।

প্রশ্নঃ উল্লেখ্য, যে এই বেলোড় গ্রামে ১০০১ন ছীড়ার রোগ তাহার শেষের অভিব্যক্তি হইয়াছিল। সম্প্রতি উক্ত বসত বাটী নিউফোর্ড হোমের পরিচালনাধীনে এসেছে।
সর্বসাথে ব্যাপকমণ্ডল
আমি বিবেকানন্দ

আমরা দেখিয়াছি, আমরা ছুঁখ দূর করিতে যতই চেষ্টা করি না কেন, আমাদের জীবনের দেশীয় ভাগই অবশ্য ছুঁখপূর্ণ থাকিবে। আর এই ছুঁখরাশি আমাদের পক্ষে একরূপ সীমাহীন। আমরা অনাদি কাল হইতে এই ছুঁখ প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক উহা যেমন তেমনই রহিয়াছে। আমরা বহি ছুঁখ প্রতিকারের উপায় বাহির করি, ততই আমরা নিজেদের শ্রুত্রত ছুঁখরাশি দ্বারা পরিবৃত্ত দেখিতে পাই। আমরা আরও দেখিয়াছি, সকল ধর্ম বলিয়া থাকে, এই ছুঁখ-চক্রের বাহিরে বাহিরবার একমাত্র উপায় ইহুদ। সকল ধর্মই বলিয়া থাকে—আধুনিক কর্মক্ষেত্র লোকদের উপদেশমত জগৎকে যেমন দেখিয়েছে, তেমনি ধ্রুপ করিলে আমাদের ভাবে ছুঁখ ছাড়া আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু সকল ধর্মই বলে—এই জগতের অতীত আরও কিছুই আছে। এই পক্ষের গ্রামায়া জীবনই সত্যুক্তি নয়, উহা একুশ জীবনের অতি সামাজিক অংশ মাত্র, বাস্তবিক উহা অতি স্থল ব্যাপার। উহার পোড়াইতে, উহার অতীত প্রস্তুত সেই অনন্ত রহিয়াছে, মেঘানে ছুঁখের লেশমাত্র নাই—উহাকে কেহ গড়, কেহ আল্প, কেহ সীমাবদ্ধ, কেহ জিহ্বাভাবে, কেহ জোড়া, কেহ বা আর কিছু বলিয়া থাকেন। বেদান্তীর উহাকে 'বক্ষ' বলিয়া থাকেন।

কিন্তু জগতের অতীত প্রস্তুত সাতা বাইতে হইবে, একথা সত্য হইলেও আমাদিগকে এই জগতে জীবন-দারণ করিতে তো হইবে? এখন ইহার মীমাংসা কোথায়?

জগতের বাহিরে বাইতে হইবে—সকল ধর্মর এই উপদেশ হইতে আপাততঃ এই ভাবই মনে উদিত হয় যে, আত্মহত্যা করাই বুঝি শেষ। প্রশ্ন এই—জীবনের ছুঁখরাশির প্রতিকার কি? আর তাহার যে উত্তর দেওয়া হয়, তাহাতে আপাততঃ মনে হয়—জীবনকে তাহ করাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। ইহার উত্তর আমাদের একটি প্রচুর গণের কথা মনে পড়ে। একজনের মাঝার উপরে একটি মশা বসিয়াছিল, তাহার এক বদ্ধ ঐ মশাটকে মারিতে গিয়া। তাহার মনকে এমন তীব্র আঘাত করিল যে, সেই লোকটি মারা গেল, মশাটিও মরিল। ছুঁখ প্রতিকারের যে উপায়ের কথা ধর্ম বলে, তাহা একরূপই।

তবে কি কোনো উপায় নাই? প্রতিকারের অস্তত: আর একটি উপায় প্রস্তুত হইয়াছে। বেদান্ত বলে, বিভিন্ন ধর্ম মাত্র বলিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঐ কথায় যথার্থত তাত্ত্বিক কি, তাহা বুঝিতে হইবে। অনেক সময় লোকে বিভিন্ন ধর্মের উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীতত্বে বুঝিয়া থাকে, ধর্মগুলিও ঐ বিষয়ে খুব স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। আমাদের হারম ও মন্তক উভয়ই প্রয়োজন। হারম অতীত খুব বড় জিনিসঃ হারমের ভিতর দিয়াই জীবনের মহৎ প্রেরণাগুলির সূচি হয়। হারমশু কেবল

লজনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ২৭শে অক্টোবর, ১৮৯৬
মন্ত্রিক অপেক্ষা যদি আমার মন্ত্রিক না-ই থাকে, শুধু একটি হয়ে থাকে, তাহা আমি শতবার পছন্দ করি।

যাহার হয়ে আছে, তাহারই যথার্থ জীবন—তাহারই উন্নতি সত্ত্ব ; কিন্তু যাহার এতোকু হয়নি নাই, কেবল মন্ত্রিক আছে, শুন শুরুতার মরিয়া যায়।

কিন্তু আমার এই জীবন যায়, যিনি কেবল নিজের হয়ন দীর্ঘ পরিলক্ষিত হন, তাহাকে আন্তক হৃদয় ভোগ করিতে হয়, কারণ তাহার প্রায় আমি হয়ে পড়িয়া সমাজে । আমার চাই—হয়ন ও মন্ত্রিকের মিলন।

আমার কথার তত্পরত্ন হয় নহে যে, কিন্তু হয়ন ও কিন্তু। মন্ত্রিকের মধ্যে আপন করিতে হইবে, কিন্তু এতেক ব্যক্তি অনন্ত হয়নাশ্রুত থাকি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচারকৃত্বিণ্ড থাকি।

এই জগতে আমার যায় কিছু চাই, তাহার কি কোন সীমায় আছে? জগৎ কি অনন্ত নয়? জগতে অনন্ত পরিমাণ তাবিকালের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ শিকারশ্রীলীন ও বিচারের অবকাশ আছে। অবাধতামের এই হই তাই একমাত্রে অপরাধের উভয়ের সমাজটার চ্যালেন্টে থাকি।

অধিকাংশ ধরনে, জগতে যে হরকালি বিজ্ঞান—এ বাংলার বুখান এবং স্পষ্ট তামাতেই উহার উল্লেখ করিয়া থাকেন বলে, কিন্তু সকলেই বোধ হয় একই আমে পড়িয়াছেন, তাহারা সকলেই হয়ন্তের দীর্ঘ, ভাবের দীর্ঘ পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। জগতে হৃদয় আছে, অতএব সংসারতাত্ত্বক—ইহার খুব বড় উপাদান এবং একমাত্র উপাদান। স্নেহেই নাই।

‘সংসারতাত্ত্বক’—সত্য জীবনে হইলে অসত্য তাত্ত্বক করিতে হইবে—ভাল পাইতে, হইতে মনে তাত্ত্বক করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু তাত্ত্বক করিতে হইবে—এ সময়ে কোন মতদৈখ হইতে পারে না।

কিন্তু যদি এই মতবাদের তত্ত্বর্দ্ধন এই হয় যে, পলাশিয়ের জীবন আমার যাহাকে জীবন বলিয়া জানি, আমার জীবন বলিতে যাহার বিভূতি, তাহার তাত্ত্বক করিতে হইবে, তবে আর আমাদের থাকে কি? যদি আমার উচ, তাত্ত্বক করি, তবে তো আমাদের আর কিছুই থাকে না।

যখন আমার বোধের দীর্ঘকালের আসে আলোচনার করিব, তখন আমার এই তত্ত্ব আরও ভালভাবে বুঝিব, কিন্তু আপাততঃ আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদান্তেই কেবল এই সমস্তের যুক্তিসম্বন্ধ মীমাংসা পাওয়া যায়। এখানে কেবল বেদান্তের প্রকৃত উপদেশ কি, তাহাই বলিব—বেদান্ত শিক্ষা দেয় জগতে ব্রহ্মভাবে দর্শন করিতে।

বেদান্ত প্রকৃত পক্ষে জগতে একবারে উড়াইয়া দিতে চায় না। বেদান্তে বেদান্ত চূড়ান্ত বৈরাগীর উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নাই, কিন্তু এই বৈরাগীরের তাত্ত্বক আত্মত্ব নহে—নিজেকে গুরু করিয়া ফেলা নাই। বেদান্তে বৈরাগীরের আত্ম জগতের ব্যাপার—জগতে আমার ব্যাপার দেখি, উহাকে আমার যেমন জানি, উহাকে যেমন আপ্যায়িত হইতেছে, তাহার তাত্ত্বক এবং উহার প্রকৃত স্রোতে অবগত হও।

জগতে প্রাপ্ত আছে—বহুবিড়কো উহা বহু ব্যাপার আর কিছুই নেই। এই করণেই আমার প্রাচীনতম উপাদান—বেদান্ত সমুদ্রে লিখিত প্রথম পুস্তকে—

‘প্রথম পুস্তকে পুরনো সংবাদের দীর্ঘ আচরণিত করিতে হইবে।

সমুদ্রে জগতে ঐশ্বর্যের দীর্ঘ আচরণিত করিতে
ছইবে—জগতে যে অন্তভ ছুঁখ আছে তাহার দিকে না
চাহিয়া, মিছামিছি সবই মঙ্গলময়—সবই সুখময় বা
সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য—একুশা ভাস্ত সুখবাদ
অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রাতঃক বস্তুর
ভিত্ত ঐসবর দর্শন করিয়া।
এই তাবে আমাদিকে
সংসার তাগ করিতে হইবে—আর যখন সংসার-
তাগ হয়, তখন অশিষ্ট থাকে কি?—ঈশ্বর।
এই
উপদেশের তাত্ত্বি কি?—তাত্ত্ব এই—তোমার
স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তোমাদিগকে
ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তো নয়; কিন্তু ঐ
ঈশ্বর মধ্যে তোমাকে ঐসবর দর্শন করিতে হইবে।
সংসার-সন্তানের তাগ কর—ঈশ্বর অর্থ কি? ছেলে-
গুলোকে লইয়া কি রাস্তায় ফেলিয়া। দিতে হইবে—
যেমন স্কুল দেশে নর-পত্তা করিয়া থাকে? কখনই
নয়; উহা তো পৈশাচিক কাও—উহা ধর্ম নাই।
তবে কি? সংসার-সন্ততিগণের মধ্যে ঐসরদ দর্শন কর।
এইরূপ সকল বস্তুতেই, জীবন-মাণে, সুখে-সুখে—
সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঐসরদ পূর্ণ;
কেবল নয়, উহা জগৎকে যেমন আন্তর্মান করিয়া,
তাহাতে তাগ কর; কারণ তোমার আন্তর্মান আশ্চর্যক
অমুকুর্ভির উপর—কুকু সমাহার যতনির উপর—মোট
কথা, তোমার নিজের শরীরলালন উপর প্রতিষ্ঠিত।
এই আন্তর্মানিক জন্ম তাগ কর—আমার একদিন জগৎ-
কে যেমন ভরিতেছিলাম, একদিন যে-জগতে আসন্ত
ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের শ্রুত মিথ্যা। জগৎ
মাত্র; উহা তাগ কর।
নয়ন উদ্ভিদ করিয়া দেখ,
আমরা বেঁথাবে একদিন জগত্তে দেখিয়েছিলাম,
একদিন পত্যকে কখনই উহার সেরূপ অষ্টম ছিলাম—
আমরা তথা একুশা দেখিয়েছিলাম—মায়া আচ্ছন
হইয়া আমাদের ঐরূপ ভম হইতেছিল, অনুষ্ঠান
ধরিয়া।
সেই পাঠী একমাত্র বিধাম।
তিনি অস্ত্র-সন্ততির ভিতরে, তিনিই ঈশ্বর মধ্যে,
তিনিই সামাজিক, তিনিই ভাষার মনে, তিনিই পাপে ও
পাপাতে, তিনিই হৃদয়কারীত, তিনিই জীবনে এবং
মরণেও তিনিই রহিয়াছেন।
বিশ্ব প্রাত বাতে! কিছু বদাম ঈশ্বর প্রাণ
করিতে, শিক্ষা দিতে ও পারে করিতে চায়।
ঈশ্বরের প্রাত।
কিছু প্রাচু আরম্ভের আরম্ভের আবার আনি।
আমারা এইভাবে সবত্র ব্যাপারন করিয়াই দেখি-
নের বিপদ ও হারানি ভাসিয়া পারি। কিছু
চাহিয়া না। আমাদিকে অসুস্থ করে কিসে?
আমারা যে-সকল দুঃখভোগ করিয়া থাকি, বাসনা
হইতেই সেগুলির উৎপত্তি।
তোমার কিছু ভাবে আছে,
আর সেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না, ফলে—
ছুই।
অভাব যদি না থাকে, তবে ছুই থাকিবে
না।
যখন আমার সকল বাসনা তাগ করিব, তখন
তাগ হইবে ? দেখাইলে কোন বাসনা নাই, উহা কখন
ছুই ভোগ করে না।
ঈশ্বর সত্য, কিন্তু দেখাইলে কোন বাসনা নাই, কোন কথো নাই, কিন্তু উহা যে চীর,
সেই চীরই থাকে।
মুখভোগের ভিত্তেও এক
ভাব আছে, ছুইরভোগের ভিত্তেও আছে।
যদি সাহস করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর
বলিয়া পারি যে, ছুইরে উপকারিত আছে।
আমারা সকলেই জানি, ছুই হইতে কি মহৎ শিক্ষা
হয়।
জীবনে শত শত কাজ করিয়াছি; পরে বোধ
হয়, না করিলেই ছিল ভাল, কিন্তু তাহ।
হইলে ঐ-সকল কাজ আমাদের মহান শিক্ষকের কাজ
করিয়াছে।
নিজের সমস্ত বলিয়া পারি, কিছু
ভাল করিয়াছি বলিয়া। আমি আনন্দিত, আবার অনেক খারাপ কাজ করিয়াছি বলিয়াও সুখী—আমি কিছু সংক্ষুয় করিয়াছি বলিয়া। আনন্দিত, আবার অনেক ভুমে পড়িয়াছি বলিয়াও সুখী, কারণ উহাদের প্রত্যেকটিই আমাকে মহু শিক্ষা দিয়াছে।

আমি এখন যাহা, তাহা আমার পূৰ্ব কর্ম ও চিন্তাসমষ্টির ফলস্বরূপ। প্রত্যেক কাণ্ড ও চিত্রস্য একটি না একটি ফল আছে, এবং এই ফলগুলির সমাপ্ত আমার এই অব্যাহতি—এই উদ্দেশ্য। তবেই এখন সমস্ত কঠিন হইয়া পড়িল। আমরা সকলেই 

বুঝে—বাসনা বড়ো খারাপ জিনিস, কিন্তু বাসনাতঃগের অর্থ কি? বাসনা তাঁগ করিলে দেহঞ্চারিত্বহই হইবে কিয়া? ইহাও কি সেই মশার মঙ্গল মায়ুর মায়র নয়? বাসনাকে সাহায্য কর, তাহার সঙ্গে বাসনাযুগ্ম মায়ুরটির সাধকের মায়ীরাখি। তবে শোন ইহার উল্লেখ কি? তোমার যে বিশ্ব-সম্পত্তি থাকিবে না, তাহা নহে; বারোজনিয় জিনিস, এমন কি বিলাসের জিনিস পর্যায় রাখিবে না, তাহা নহে।

যাহা কিছু তোমার উপযুক্ত, এমন কি তদতিরিক্ত জিনিস পর্যায় তুমি রাখিতে পারেন—তাহাতে কিছুমাত্র কর্ষণ নাই। কিন্তু তোমার প্রথম ও প্রান্ত কর্ষণ এই যে সত্যকে জানিতে হইবে—প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

এই ধন—ইহা কাহারও নয়। কোন পদার্থ বামের ভাব রাখিয়া না। তুমি তো কেহ নহ, আমিও কেহ নহি, কেহই কিছু নহে। সবই সেই প্রকৃত বস্তু যে শোনানিয়মের প্রথম ঘোষে বলা হইয়াছে——ঈশ্বরের সৰ্বনিত্য ভিত্তির স্থাপন কর।

ঈশ্বর তোমার ভোজনী থানে রহিয়াছেন, তোমার মনে সেসকল বাসনা উঠিতেছে, তাহাতে রহিয়াছেন;
মতে বসিরা থাকিলেই হইল, কিছু চিন্তা করিবার রাত্রি কেনা কাজ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; আদর্শবাদী হইয়া, ঘটনাচর্চা তাড়িত হইয়া, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইত্যাদি বিচরণ করিলেই হইল। ইহাই ফল দাড়াইলে। কিন্তু পূর্বের উপদেশের অর্থ-বাস্তবিক তাহা নাই। আমাদিগকে আবশ্যক কার্য করিয়া হইবে। সাধারণ মানুষের যে বাণী সানাই ইত্যাদি ঘৃরিয়া। বেড়াইলে, তাহারা ক textAlignO কি জানে? যে-ব্যক্তি নিজের ভবরাশি ও ইতিভ্রাণ্ণ দ্বারা পরিচালিত, সে কাজের কি বুঝে? তিনিই কাজ করিতে পারেন, যিনি কোনোরূপ বাণী দ্বারা, কোনোরূপ খাদ্যপত্র দ্বারা পরিচালিত নন। তিনিই কাজ করিতে পারেন, বাণী মাত্র। কাজ করিতে পারেন, বাণী কোন লাভের প্রাপ্তান্ত নাই।

একথানো চিত্র কে বেশী উপভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্রকারি বা বিক্রেতা তাহার হিসাব-কেতার লইয়াই বাড়না তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিত্রকে মন। ঐ সকল বিষয়ই তাহার মায়ের ঘৃরিয়া। সে কবর নিলামের হাতের ডিকের দিকে লক্ষ্য করিয়াছে এবং দর নাট মাটি, তাহা সুনি-লার। দর কিংবা তাড়াতাড়ি উঠিলেনা, তাহার সুনিল। সে বাঁক। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কথন? তিনি চিত্র সংগ্রহ করিতে পারেন, বাণী বেচা-কেনার কোন মতবাদ নাই।

তিনি ছবিবানীর দিকে চাহিয়া থাকেন, তাহার অন্তত আনন্দ উপভোগ করেন। এইভাবে সমগ্ৰ ব্যবসায়ের একটি চিত্রগুলো; সেখানে বাণী এক্সেলেন্ট চলিয়া যাইবে, তখনই মায়ের জগৎকে উপভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই অমায়ক অধিকার বোধ থাকিবে না। তখন জন্ম নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতারা নাই, জটা তখন একান্ত স্বন্দর চিত্রের মতো। ঐক্য সন্ধ্যে নিয়মে খারাপ মর্যাদা। স্বপ্না কথা আমি আর কোথাও পাই নাই, তিনিই মহৎকরি, প্রাচীন করি—সমগ্র জগৎ তাহার করিয়া, উহা অন্তত আনন্দেচ্ছা লিখিত, এবং নানা পোষক, নানা ছন্দে, নানা তীব্র একাশি।

বাণীর সংগ্রহ হইলেই আমারা ঐক্যের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ করিতে পারিব। তখন সবই ব্যবহার ধারণ করিবে।

বেদান্ত বলে, এইরূপ ভাব আশ্রয় করিলেই আমারা চিত্র কার্য করিতে সকল হইবে। বেদান্ত আমাদিগকে কার্য করিতে নিষেধ করে না, তবে ইহাও বলে যে প্রথমে 'সংসার' তার করিতে ইহাও, এই আপত্তি প্রতিযোগ যাবার জগৎ তার করিতে ইহাও। এই তারের অর্থ কি? পূর্বে বলা হইয়াছে, তারের প্রকৃত তারুণ্য—সঙ্গত ঐক্যের মধ্যে। সমগ্র ঐক্যবুদ্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্য করিতে সকল হইবে। যদি ইচ্ছা হয়, সত্ত্ব তাজিয়ার ইচ্ছা 

কর, যত কিছু সাংসারিক বাণী আছে ভোগ করিয়া লও, কেবল ঐগুলিকে ব্যবহার সেবন কর, যেরূপ ভাবে পরিণত করিয়া লও, তারপর সত্ত্ব জীবন- 

যাপন কর। এই জগতে দীর্ঘকাল আনন্দ পূর্ব 

হইয়া কার্য করিয়া জীবন সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা কর।

এইরূপে কার্য করিলে তুমি প্রকৃত পথ পাইবে। ইহার ব্যাক্তি অন্ত কোন পথ নাই। যে-ব্যক্তি সত্যি কি, না জানিয়া নিবেদনের মাঝে সংসারের বিলাস-বিফুর্ত নির্মাতা হয়, বুঝিতে ইহার সে প্রকৃত পথ পাই নাই, তাহার পাই পিছনে গিয়াছে। অগ্রপুরুষ বে- ব্যন্তি হাতে অভিন্নপূর্ণ করিয়া বনে গিয়া নিজের
বেদান্ত বলে, বাসিন্ধের বিশাল স্থানের তীর বসি তুষার মরিতেছি। রাশীর খাদের সমুদ্রে বসি আমার কৃষ্ণধারণ মরিতেছি। এইখানেই অনন্তনয় হৃদয় রহিয়াছে, আমার উহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার উমার মধ্যে রহিয়াছি, উহা সবর্ধিন আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছে, কিন্তু আমার সবর্ধিন ইহাকে অন্ত কিছু বলিয়া তুলিয়া করিতেছি। বিভিন্ন ধর্ম আমাদিগকে সেই অনন্তনয় হৃদয় দেখাইয়া দিতে আহ্বান। সকল সঙ্কটই এই অনন্তনয় হৃদয়ের অধেষ্ঠ করিয়াছে। সকল জাতিই ইহার অনবেদণ করিয়াছে, ইহাই ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য, আর এই আদর্শই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামান্য মতভেদ আছে, সেগুলি ভাষায় বিভিন্নপ্রাপ্ত। মাত্র—বাংলাকি কিছু নয়। একজন একটি লোক একেবারে প্রকাশ করিতে হয়, আর একজন একটি অগ্নিভাবে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তুমি হয়তো অন্ত ভাষায় ঠিক তাহাই বলিতেছ। কেহ হয়তো সুখ্যাতিলাভের আশায়। অথবা সবকিছু নিজের মনের মতো করিতে চায় বলিয়া বলে, 'এ আমার মনোমিত মত।' ইহা হইতেই আমাদের জীবন দ্বিপঞ্চ সংগীতের উৎপত্তি।

এসবক্ষে আমার এখন নানা তর্ক উঠিয়েছে। যাহা বলা হইল, তাহাই মুক্তি বল। তো খুব সহজ। ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিয়েছি; সব অগ্নিভক্তি কর—সব একমাত্র দেখ, তবুও তিনিতে এসবার সকল করিতে পারিবে। কিন্তু যখনই সংসারের আমার কোনকোন ধারা হয়, অনন্ত অক্ষরুদ্ধি উত্তীর্ণ যায়। তাই যদি হইল, তবে এসবক শিক্ষার কি আয়োজন? বিশেষ আয়োজন
আছে। বুঝতে রাখা চুটি একদিন কিছু হয় না।

'আমার বা অরে শ্রেণিরা। মন্তব্য। নিদিহ্যা-নিবিতা।' ।—আমার সম্মত প্রথমে শুনিয়ে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে, পরে ক্রমাগত ধার করিতে হইবে। সকলেই আকাশ দেখিলে পায়, এমন কি, যে সামাজ্য কৌটি ভূমিতে বিচ্ছিন্ন করে, সে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীলবর্ণ আকাশ দেখিলে পায়, কিন্তু উহা আমাদের নিকট হইতে কত—কত দূরে রহিয়াছে, বলে। দেখি! ইচ্ছা করিলে তো মন সর্বনামে গমন করিতে পারে, কিন্তু এই শরীরের পক্ষে হামাগৃহি দিয়া চলিতে শিখিয়েই কত সময় অতিরিক্ত হয়। আমাদের সমুদয় আদর্শ সম্বন্ধে এইরূপ। আদর্শগুলি আমাদের অনেক দূরে রহিয়াছে, আর আমারা কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছি। তথাপি আমরা জানি, আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ থাকাই আবশ্যক। তর্কার্গাটে অধিকাংশ ব্যক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ ছাড়াই জীবনের অন্ধকারে পথ হাতে ধরিয়া দেখে 

বাহার একটি নিদিহ্য আদর্শ আছে, যে যদি জীবালটি অমন পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, তবে পক্ষাশ্র হাজার অমন পতিত হইবে, ইহ নিশ্চয়। অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ সম্বন্ধে যত বেশী পারা যায়, শুনিয়ে হইবে; ততদিন শুনিতে হইবে—ততদিন না উহা আমাদের অন্তঃ প্রেমে করে, ততদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, ততদিন না উহা আমাদের প্রতি শেষিতকিন্তুর ধরিত হয়,

বাল্যদিন না উহা আমাদের শরীরের রক্তে রক্তে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদিগকে প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়ে হইবে। কথিত আছে যে, 'হৃদয় পূর্ণ হইলেই মুখ কথা বলে, সেইরূপ হৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাজ করিয়া থাকে।

চিন্তাই আমাদের কর্মশ্রুতির গ্রেঞ্জন করিতে। মনে সর্বোচ্চ চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখা, দিনের পর দিন এসকল ভাব শুনিয়ে থাকে, মাঝে মাঝে মনে উহা চিন্তা করিতে থাকে।' প্রথম প্রথম সকল না হও, কিন্তু নাই, এই বিকল্প। সম্পূর্ণ ব্যাপ্তিক, ইহা মানবজীবনের সৌন্দর্য। এরূপ বিকল্প না থাকিলে জীবন কি হইত? যদি জীবনে এই বিকল্পকে জয় করিবার চেষ্টা না থাকিত, তবে জীবন ধরণ করিবার কোন মূল্য থাকিত না। উহা না থাকিলে জীবনে ক্ষত কোথায় থাকিত? এই বিকল্প, এই এম থাকিলে বা; গল্পকে কখন মিথ্যা।

কথা বলিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা চিন্তাকাল গরমই থাকে, কখনই মানুষ হয় না। অতএব বার বার বিকল্প হও; কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; সহস্রবার এই আদর্শ হয়ে ধরণ কর, অর যদি সহস্রবার অক্ষত-কার্য হও, অর একার্থ চেষ্টা করিয়া।

সর্বোচ্চে একস্তরেই মানবের আদর্শ—উদেশ্য। যদি সকল বস্তুতে তাহাকে দেখিতে না পাওয়া, অন্যতম তাহাকে সর্বোচ্চে ভালবাসো, এমন এক ব্যক্তিবিষয়ে তাহাকে ধরণ করিতে চেষ্টা কর—তারপর আর এক ব্যক্তির মধ্যে; এইরূপ একেবারে হইতে পারে। আমার সমুদ্রের তো অন্য জীবন পড়িয়া রহিয়াছে,—অবসানের সময়ের চেষ্টা করিলে তোমার ভূত বাসনা পূর্ণ হইবে।

[ স্বামীজীর বাণী ও রচনা হইতে গৃহীত ]

1 ঈশ্বরের, মানুষের
2 রুহ উপনিষদ, ১৬৪১ ; ১৬৫৬
ঘোষ বন্ধন করেন, প্রেম শিখতে পারিয়েছিল আমাদের। হরিয়ানা শিখ প্রেমকে আত্মাতের অন্যতম ক্ষীণতা করে গেছে। নতুন আলোকে প্রেমিকে উদ্ভাসিত করে ওঠে। তাঁর বলেন থাকুক, আমার প্রেমকর্ম পুরুষ, আর ঐতিহাসিক, সমাজ-তাত্ত্বিক, বিশ্বাসঘাতক তাঁদের মহামার, মহাপুকুরগুলো স্বাক্ষর করে নেন। ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক গুরু, সত্যিকার, হরিয়ানা মুহম্মদ, কনিষ্ঠার সাথে, নানাজন, কবির, শ্রীচৈতন্তে, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং অন্যরূপ আমার প্রেম জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীতে যুগে যুগে। আর তাঁদের সাধনার প্রভাবে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি যুগে যুগে অস্তিত্ব-সক্রিয়তা অতিক্রম করে নবজীবনের পথে অগ্রসর হয়েছে, তাঁদের অবিচ্ছিন্নতা অবদানে, তাঁদের চারিত্রিক প্রভাবে, দিব্যজীবনের আলোকে পথহরান্ত মানবগুলো নতুন পথের সন্ধান পেয়েছে। পুরাণ- ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁদের সীমা দিব্যীর কাহিনী চরিত্রের জগৎ স্রোতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠ রয়েছে।

আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে আমাদের এই পুণ্যমূর্তি ভারতবর্ধে তেমনি এক দিব্যজীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল, আবির্ভাব ঘটেছিল আমাদেরই এই বঙ্গদেশে শ্রীকাল নববীপে। তিনি এক প্রেমের  ঠাকুর, প্রেমবাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তার সেই প্রেমের মন্দকিনীরাঢ়ের পুত্র বন্ধনকে নয়, এমন কি শ্রুতি বিনিয়োগের মাতিতে নয়, সমগ্র পৃথিবীর এক দিব্য জীবনের পথে প্রসারণ করেছিল। চৈতন্য সমকালীন কবি পরমাণু দাস তাকে পরমাণুর সাথে তুলনা দিয়ে তুলনাহীন হুদ্দে পাররাম। তার কথা থাকেঃ

'পরমাণুর সাথে কি দিব তুলনার পরিশ্রম হোয়াইলে হয় নোন।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে'
রতন হইল কত জনা!'
চৈতন্যের পুরুষ কবি গোকিন্দদাস তাকে দেখেছেন 'অভিনব হেমকান্তর' রূপে, 'অবিলম্ব প্রেমরতন ফল বিতরণে অক্ষিল মনোরথ' তিনি বিশ্বাসের পূর্বে করেছেন তার অনুপ্রাণিত কাব্যমাধুর্যে রেখে গেছেন কবি মন্মথ তুলনার জন্য। আর পূর্বোক্ত পরমাণুদাসের ভাবায় এই প্রেমের ঠাকুর—'না মানিয়ে অক্ষিল ভূতন ভরি জন্মে যাচ্ছি দেওয়া প্রেমীর পদ এই প্রেমের মনে পড়ে।

"বাধি গৌরাঙ্গ নহিত কি মনে হইত কেমনে ধরিতাম দে।"
রাধার মহিম। প্রেমরস-সীমা জগতে জানাতে কে।

ধ্যায়পাক, হবুড়া শ্রীচৈতন্য কলেজ।
মহান রুদ্র-বিপিন-মাধবী প্রবেশ-চাঁদুতী-সায়।
বর্জ-যুবতী তার ভক্তি শক্তি হইত করাতূ।
আর একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে শরণ করিল।
মহাপ্রভুর অবিভাজনের প্রায় চারশেশ বছর পরে আর
একজন মুগালবাটার, প্রেমের ঠাকুর শ্রীশিবারমকুকে
পরমহংসদৈব একজন 'বিজয়ী ভক্তসঙ্গ সংকীর্তনানর্থে' নিজী কোন মন্ডলে বৈষ্ণবকর্তা, একটি নগর
ধরেছিলেন:
‘প্রেমধন বিলায় গোরা রায়।
প্রেম কলসে কলসে চালে মত না ফুরায়।
ঠাক নিয়াও ঠাকে আর। আর। ঠাক গোরা ডাকে আর! (এ) শাস্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।"
এই সব কি শুধুই কবি-কথা, শুধু কলস বিলাস? আর শুধুই কি শাস্তিপুর-নদীয়া এই প্রেমের ঠাকুরের
অমাত্য প্রেমভায় ভেসে গিয়েছিল? সায়া গোরাড়ে
বঙ্গই যে সে প্রেমের ভক্তি প্রাপ্তি হয়েছিল, এক
কালক্রমে সমগ্র ভারতভূমি এমন যে কি সমগ্র পৃথিবী
যে এই প্রেম-গৌরবের প্রভাবে অমূর্ধ্বিত-প্রভাবিত
হয়েছিল—ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তা চিত্রালোকের
জন্ম মূলিত হয়ে যায়। শুধু ভক্ত-ভাবুক নয়, শুধু
রসিক-প্রেমিক কবিদের উপলব্ধি-অমূর্ধ্বিতেই নয়, শুধু
বৈষ্ণবের মম্মুলামেই নয়, এমনকি যুবকবাদী
মননশীল, সামাজিক বিচার-বিলোপেণে এস-সত্য
চিরভাস্ত হয়ে যায়। মহাপ্রভুর এই প্রেম
সর্বমূল, প্রেমদাতাহের উন্মুল পরিচয়ে কেন নিব
নেরের মাধ্যমে মাটির প্রদীপ দিয়ে সূর্যকে দেখানোর
মতোই অকিংকর, হাস্যকর বলার বলে আমাদের
মনে হয়। তবু তার দিব্যরূপের অমূর্ধ্ব উপলব্ধি
আছেই, আমাদের ‘চতুর্দিকমার্জন’ এর জন্যে—
ভক্ত-প্রেমিক-রসিক এবং বিদ্যুত আচার্যগণের বালী-
মূঢ়বিতি সমুহ করে এই গৌরব দিবারীবেদের অমূল্য
আমরা আবর্জনালে মনে করি। এই প্রসঙ্গে
শ্রীশিবারমকুকের শৈল সন্ধ্যায় বিশ্বব্যাপীর,
শ্রম বিবেকানন্দের একটি বাগী শরণ করে: "সমগ্র
ভারতের শক্তি সকারকারী আধিবাসীর একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচেতনা।
... ভাবে যাত বড় বড় শক্তির আচার্য আসিয়াছেন—প্রেমরূপ স্বাভাবিক, শ্রীচৈতন্য
দিয়ে অম্বু বর্ষণ।" আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের
অবিস্মরণীয় একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ভাস করে—প্রেম পৃথিবীতে একমাত্র মাত্র রূপ
পরিক্রমের করিয়াছিল, তার বঙ্গলাদেশ। প্রেম একটি
ভাবসার, আর চৈতন্যের এই প্রেমেরই এক দিবা
বিগ্রহ, এই সিদ্ধান্ত সমস্ত—আর তার পরম-
বিয়োগকার, অত্যাচার জীবনশৈলীর জন্যে প্রেমের
প্রাক্ষ ঘটে নানারূপে, নানাভাবে, বিচিত্র ঘটনা
প্রবাহে।


d
এই জীবন্ত প্রেম-বিগ্রহের যথার্থ রূপক কি এবং
তার অবিভাজনের মূল কারণ বা তার পর্বক কি—
এ সম্পর্কে আলোচনার এই সূত্র বিবেকে সন্তব নয়।
অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ে তত্ত্ব বৈষ্ণবচেতন তথা ভক্ত
বৈষ্ণবমূর্তিসভ্যতার অভিভাষ উল্লেখ করছি মত।
তাদের অভিভাষ যেহে কৃশকুটী বৈষ্ণব ভাব-কাশ্ব
করে কল্যাণে শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভুরূপে অবতার
হয়েছেন। তাদের ধ্যানুশীলিতে শ্রীগৌরচন্দ্র 'রাধাক্ষণ অধ্যায সমঝিত কৃত্যরূপে।' তিনি 'অন্তরূপবাচিত গভীর'। ওসমান মানুষ শ্রীচৈতন্যচতুরতা মূলের শ্রীকৃষ্ণবাচিত কৃষ্ণদাস কবিদের গোষ্ঠী তো সম্প্রতিভাবেই
যোগেন্ঠিক করেছেন—
নমস্ত্র বলি যামে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষি অবতরিন চৈতন্য গোসাইরী।
তাঁর বক্তব্যের সম্পর্কে মহাপ্রভুর সাহে তিনজন
অন্তরূপ পার্থের অন্তর্ভুক্ত শ্রীল শ্রীরাম দানীলার
গোষ্ঠীর গোকান্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরের
একটি এই—
শ্রীরাধার গোসাইরী মহারাজ। বান্ধববাস্তু।
যেনাং মূল শ্রীকৃষি কৌশলে বা মাদাঃ
সৌধু ভাস্বাস মহাত্মি বান্ধববাস্তু।
তত্ত্বাত্মক সম্ভব না জন্মাত্মিক নহে।
অথবা শ্রীরাধার গোসাইরী কর্তৃপ, ঐ গোসাইরী
রা শ্রীরাধার আমার বে অর্থ মাথুর আসান
করেন, অন্য মাথুর বা কর্তৃপ এবং আমার মাথুর
আসান করে শ্রীরাধার বে ক্ষে অমাহ করেন, অন্য
থাকে বা কর্তৃপ—এইবার ১) বিষয়ে লোভ
বসত শ্রীরাধার ভান্দ্রাঙ্গ হয় শ্রীধরের গোরুপ
সীমাতে শ্রীরাধার ঐ বে মাত্র অবিচিত হয়েছে।

নীলাচল লীলার শেখ বার বংশ বাণ্ডাট বাণ্ডাট
অবিশ্ব মাহাপ্রভুর কৃষি বিরহের অতিক্রমে অভিবাধিত
হয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃত গোসাইরীলার কর্মায় তা
কিয়ৎক্ষেত্রে বিচরণ করে।

শ্রীরাধার গোসাই যেই উদ্ভব দর্শনে এই মাত্র দশ প্রভু হয় রাখিতে।
প্রেমিক তম্ম রায় যাতেন্দ্রন নিজে কৃপা করে
গোরুপ যে রায় ও কৃপা মিলিত বিশেষ তা ক্ষুদ্র
দেখিয়েছিলেন তিনি—
তবে হাসি তার প্রভু দেখাইলা শ্রুপ।
রসরাজ মহাভাব হুই একরুপ।
সংক্ষেপে বলা যায় গৌরীয় বৈষ্ণবাচার্যদের সম্পূর্ণ
অভিমত—রসের লীলাম শ্রীকৃষি শ্রুপ ভঙ্গার
মহাভাব সরাপিপি শ্রীরাধার গোসাইরী মাথুর আসান ও
গোসাইরীর মাথুর পরিপূর্ণের জন্য শ্রীগোসাইরীর ব্যর্থ
কলিয়ুগে অবিচিত হয়েছিল।

t
কিন্তু এতে তো হল তত্ত্বরূপ। বাণ্ডাট আমার
সাধারণ মাথুর কি করেছি এই বিশ্ববিদ্ধ দেহ
মানবের কাছ থেকে, কি তার অবদান অগ্রস্তি
সাহিত্যে এক সমাজের আপামর সাধারণের জীবন?
প্রথমে সবিনয়ে জানাই—তার অবদানের সম্ভাত
পরিচালনা অথবা শ্রুপ নিবন্ধে গোসাইরী
কর্তৃক শ্রুপ নিবন্ধে গোসাইরী
কর্তৃক অবরোধ হয়।
হুঁ সংক্ষেপে তার অবদানের সম্ভাত
ধরা থাকে। এই প্রক্ষে বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম
রসরাজ পরম শ্রুপের শ্রুপের একতা চরিতের
eকটু উল্লেখ করি প্রথমে এই—“শ্রীরাধার
নিবন্ধে কাছাকাছি রসবিদ্ধ রক্ষার পুরুষ।
সমস্ত মাহাপ্রভুর মাথুর দৃষ্টি-পরিপূর্ণে তার ক্ষুদ্র মাথুর
মহিমা প্রতিপন্ন হয়েছে। এই হাসিকাঁহার
সৃষ্টিতে তিনি জাগতিকান তথ্য, দানিকাঁহার সৃষ্টিতে
তিনি তাবদ্ধু মাথুর তুলে। তত্তার অপরাধ অভিজ্ঞেয়
তিনি লীলার পুরোহিতাম।”

শ্রীম মাহাপ্রভুর সর্বাধিকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ
অবদান—প্রেম। এই প্রেম মানবি এবং অধ্যায
ধ্রুম উষ্ণ অধ্যায় এখান শ্রীম। তার শ্রীস্তুতের উক্তি
‘জীবে প্রেম দিয়ে জানি কৃষির অধিষ্ঠান।’ বৈষ্ণব
তথ্য তথা ফাতিহার অন্তর্ভু শ্রেষ্ঠ সাধক পরম
ভাগবত, পরমাত্মের মহান্তম ক্ষুদ্রাচার্যর কথার
বলা যায়—“কৃষি প্রেম জীবপ্রেম এক রেখার হাত
প্রান্ত। এই হুই প্রেমের অথবা মূলন মূঢ় শ্রী
গোসাইরীর ব্যর্থ। সৃষ্টিতর ভঙ্গারে প্রেম, বিশ্বারী
মানবন শ্রীগোসাইরীর একাধে একিশু।’
ধনীদরিত্ব (Have & have-nots), ব্রাকট-শূন্ত, হিন্দু-মুসলমান এক কথায় মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠীর মানবের প্রতি এমন সর্বাঙ্গক গ্রেম বোধহয় জগতে আর দেখা যায়নি। পার্শ্ব জগাই-মাহাই, দরিদ্র খোলা বোকা থাকে। শৈব, নিশ্চি শোকার প্রভাবকার, যখন হরিদাস, মূর্তকৃ রায়, মথুরা বুদ্ধিবিদ্যান থেকে ফেরার পথে পাঠানদের বৈঞ্জনিক ইনস্যিশ করতে অন্তর্জাতি জীবাশ্ম ছড়িয়ে আছে এই প্রেমমতার গ্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের নিন্দকারা, আমার বিনারে গ্রেম-বিদ্রোহ।

এই উদার মানবপ্রেম তথা মান-ব্যবসায়িক নতুন মূল্যতাপনবাদের অস্তিত্বে তাঁর এই নবায়ন ধর্ম-সাধনায় প্রবর্তন হল। আর তাঁর আচরণের গভীরতা তাঁর প্রতি হিপ এক নূতন ধর্ম নিবন্ধন—চাঁদনৈতিক সৃষ্টির সমন্বয় হারিতে পারিয়েন।

বর্তমান যুগে আমার বিপ্লব (Revolution) কথাটির সঙ্গে খুবই পরিচিত। এখন থেকে পাঁচশশ বছর আগে মানুষ যখন বিজ্ঞ-অনৈতিক প্রবন্ধে জড়িত ছিল—সেই যুগে উচ্চ ব্রাহ্মণগণের এই সমস্ত সমস্ত সমাজের হাতে পড়া জাতিগত বিবেদ-বৈম্যাহ বিচারের অভাব থেকে দাঁড়িয়ে ফেলেছে।

বর্তমান যুগে আমার বিপ্লব (Revolution) কথাটির সঙ্গে খুবই পরিচিত। এখন থেকে পাঁচশো বছর আগে মানুষ যখন বিজ্ঞ-অনৈতিক প্রবন্ধে জড়িত ছিল—সেই যুগে উচ্চ ব্রাহ্মণগণের এই সমস্ত সমাজের হাতে পড়া জাতিগত বিবেদ-বৈম্যাহ বিচারের অভাব থেকে দাঁড়িয়ে ফেলেছে।

এই বিপ্লবের কর্মকাণ্ডের মূলে নিহিত ছিল এই দেবমান চরিত্রের অন্যায় শক্তি এবং ব্যক্তিগত জীবনের আচরণ। উপদেশ নয়, তাঁর আচরণই একক্রিয়ে প্রচুর কাজ করেছিল।”আমার আচরিত ধর্ম জীবনের শিখাইমু’—এই ছিল তাঁর মূলনীতি।

আর তাঁই ফলে হয়েছিল অনেক সত্য, অসত্য সাধন। একাদশ আমরা যা বলিতা তা বিশ্বাস করি না, যা বন্ধুতা দিতা তা নিজের জীবনে আচরণ করি না। তাই আজ আমাদের সাধনে, রাখ এতে অংশগ্রহণ, এতে বিশ্বাস, এতে বিনিময়, এতে অসাধারণ হয়।

এই মানবতার বিস্তার বিস্তার কোন প্রথা চরুনি করেননি। ‘শিক্ষাভিষ্ক’ (এবং মতাস্বরূপে জগাই-প্রাণিত) নামে কেয়ার মাত্র কোন তাঁর স্বীকার বলে জানা যায়, কিন্তু তাঁর দিবা জীবনামই ছিল এক উচ্চ প্রাণ, তাঁর জীবনই ছিল তাঁর বাণী, তাঁর আচরণই তাঁর উপদেশ-নির্দেশ।

আর তাঁই ফলশ্রুতি এক নবীন স্থান।

একাদশ আমার মহাযুদ্ধ। গাবীর বিন্দুশ্রেষ্ঠ শাসকের বিহিতে আইন-আমাহ আন্দোলনের সৌন্দর্য কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু একথা কি জানি যে এখান পাঁচশো বছর আগে মহাপ্রাচী ঠিক অস্তর আন্দোলন করেছিলেন? নবীনের শাসনকের চাটদকারী ঐ সময় প্রকাশে সংকটের নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করেছিলেন, কিন্তু শাসকের তাঁদের যে সত্য আদেশের বিভিন্ন সাধারণের রূপে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

নির্দিষ্ট দিনেই তাঁর নির্দেশে প্রাদেশ সময়ে নবীনের নগরীর প্রতিটি গৃহদায়ে মহলটে, আলোক-মালার সজ্জিত হয়েছিল এবং গভীর মুদ্রকোষে আকাশ-বাতাস মূখ্যতার করে এক বিরুদ্ধ সংকটে শোভাযাত্রা। মিশান সাজার যখন ঠাই কাজীর ভবন সমুদ্র উপনীত হয়েছিল, তখন ঠাই কাজী তাঁর নির্দেশে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বলা-বাধ্য এই সংকটের শোভাযাত্রার পরিচালক ছিলেন সংহ মহাপ্রাচী। আধুনিক কালের গণ-আন্দোলনেরও
প্রথম প্রবর্তক এক নিকটিকন তেজস্বী সম্প্রদায়—এই গোসীরচন্দ্র।

কলী ভাববুতি শ্রীমহাভক্তের চরিত্র বর্ণনা প্রস্তাঙ্গে যে বলেছিলেন—"বজ্রাদিপি কঠোরানি, মুহূর্তি কৃত্তুমাদিপি" ( বজ্রের চেলেও কঠোর, আবার দুলের চেলেও কমল) লোকের পূর্বে শ্রীভক্তেরদের জীবন-চরিত্র তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আগারের বিকৃত্তে তার তৃষ্ণিক। সিংহসনগুলি—ঢাট কাজীর বিকৃত্তে তার অহস্ত সংগ্রাম, ছোট হরিদাস বর্জন ইত্যাদি অগণিত ঘটনায় রয়েছে তার প্রমাণ। আর তার কৃস্মকোমল চরিত্রমূল্য তো সমষ্টি লীলাতেই বর্তমান।

এই দিব্যজীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান—
যা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সজীব-শিক্ষা-সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার নানা ভাবে রূপান্তরিত। নিবন্ধমালিতের আশঙ্কায় তার আলোচনা থেকে বিরতি হলাম।
আমাদের ধর্ম-দর্শন-সাধনা, ধ্যান-ধর্ম সবিকৃত তার অবদানে সমৃদ্ধি, অসুগ্রাহিত। এমন কি আমাদের বহুলাধিক, বিশ্বকল্যাণ-চেতনা সমস্ত কেন্দ্রেই লুকাইতে রয়েছে চৈতন্য-প্রভাব। তিনি একদিন বলেছিলেন :

"বজ্রদেশে আছে মোর দুই সমাজের।
জননী জাতিবী এই দুই মহাশয়।"

তারই কথা উচ্চারিত হয়েছিল দেশহিতকরের মহীনায়।

"ভারত তুমিতে হৈল মনোময় জন্ম যার।
জ্ঞান সার্থক করি কর পর-উপকার।"

তারই শ্রীমুখের বাণী :

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।"

আজ সত্যে পরিণত হয়েছে—অক্ষরে অক্ষরে।

এই মহামানন্দের, এই দিব্যজীবনের উপদেশ-নিদেশ-আচরণ অন্তর্যামা সাধা জাগিত রেখে জীবনরতে অগ্রসর হলে আমাদের ব্যক্তিভুক্ত ও সমাজভুক্ত সবর্বভাবে সার্থক ও ধনী হবে বলে আমরা মনে

করি।

শ্রীমন্মহাপাতাল পরক্ষ শততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে
তার তীর্থরণে একটি কেটে দূরবৎ প্রথাম নিবেদন

করি:

নামে মহাবিদ্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রাদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচেতন্ত নামে গৌর-চ্যুর্ধে নাম।

মহাবিদ্যা কৃষ্ণপ্রেমায় কৃষ্ণচেতন্ত নামে গৌর-
কাহুত্তী কৃষ্ণস্রোতোন্তে নমঃকার।
মৃত্যুর পর সমস্ত পাথুর লজ্জাতে সিরিমূ
নং কুপ্ত তমোপন বন্ধ পরামর্শ মাধবমূ।
পরম পূজাপাদ শ্রীমত্যামী বীরেশ্বরানন্দী মহারাজের তিরোধান হয়েছে কর্তিকন অল্পে।
বিবেকানন্দ সেনানীর পক্ষে থেকে আমরা আজ তাঁর চীরেরে শ্রদ্ধান্তলি নিবেদন করছি। শ্রীরামকৃষ্ণ
মঠ ও মিশনের তিনি দশম সজ্জিঙ্গু এবং উনিশ বছরের কিছু বেশী এই উচ্চতার অনুজ্জল করেছেন।
গত ১৩ই মার্চ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পদে লীন হয়েছেন।

১৯৩৬ সালে যখন তিনি কলকাতা অধীনে আসে ছিলেন তখন থেকে প্রায় পাঁচ বছর ধরে তাঁকে
বিভিন্ন ভাবে দেখা ও তাঁর সুনিশ্চিত নীতি করার সাহায্য অর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁতে বিশেষ কোন অধিকার
দাবী করতে পারছি না। কারণ আমাদের আধার

তাঁতুকু তদন্তনাতীত আমাদের ধারণা বদ্ধ করেন।

শ্রীমত্যামী গৌতমভাষাবান্ধী মহারাজ বেলুড়ে অনু
শ্রেষ্ঠ মরণসভায় পালিত এক বার্ষিক বলেন, শ্রীমত
বীরেশ্বরানন্দী মহারাজ থেকে গুরুপদের এক অপূর্ব বিকাশ
হয়েছিল। কথাটি বিশেষ তাংসিয়রুপুর। গুরু শ্রেষ্ঠকে
শ্রীনিজিতকর। সজ্জিংগুর আস্তেন যিনি বসেন তিনিই
শ্রীনিজিতকর্তৃ বলে। প্রতিভার মূল সহায়ক।
শ্রীনিজিতকর তাঁর মধ্য দিয়েই যুগান্ত প্রতিভার
কাজ করে চলেন। শ্রীনিজিতকর, শ্রমীজার ও তাঁদের
প্রিয়তম প্রাতিনিধি, যিনি আজ তাঁদের চীরে
লীন হয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের শ্রদ্ধা
সহস্র প্রণিপাত নিবেদন করছি।

১৮৯২ খ্রীঃ মাদ্রাজ সহরে পূজাপাদ মহারাজের
জয় হয়, তাঁর বাল্যনাম পাপিরুক্ত পুরুষু। যে সাদৃশ্য
বাণিজ্য পরিবারে তাঁর জন্ম, তাঁদের পূর্বপুরুক্ত গৌরুর
বা আদর্শে থেকে এসেছিলেন বলে শোনা যায়।
পিতা ছিলেন কৃষ্ণ প্রভু ও মাতা নেত্রাবালী। পিতা
মাদ্রাজ কৃষ্ণ আগারের প্রণিপাতে ছিলেন। প্রধান
বছরের শিশু পাপিরুক্তকে রোধ মাতা পরলোক গমন
করেন। তাঁর কিছুদিনের মধ্যে জ্ঞান বিবেকানন্দ
পাশ্চাত্য বিভিন্ন করে মাদ্রাজ উপস্থিত হন এবং তখন
বাবার কেলে চেপে পাপিরুক্ত শ্রমীজার দর্শন
করেন।

বাবাও অল্পদিনের মধ্যে গত হওয়ায় ম্যাগ্নালোর-
বাসী মাদ্রাজের মেহনাইডে আশ্রয় পান পাপিরুক্ত।
সেখান থেকে এটোপস, ও এফূ, এ, এবং মাদ্রাজ
প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থ বিভাগ সহ বিএ
পাশ করেন। ম্যাগ্নালোরের কানাডা উচ্চ বিদ্যালয়ে
কিছুদিন তিনি শিক্ষকতা করেছিলেন। খেলা-ধুলায়
তাঁর খুব আগাছি ছিল। একদিন টেনিস খেলে
ফিরেছেন এরম সময় একবার কাছ থেকে তিনি পান
শ্রমীজার ইতের চচনালে। এই বইটি অধ্যায়
করে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল।

অধ্যায়, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতার ফ্লেটফুট হোস।
১৯১৬ খ্র ২৪ বছর বয়সে পাটুলঘর মহারাজ মঠে যোগদান করলেন। সেখান থেকে হাজির হলেন বেলুড় মঠে। পূজ্যপাদ শিবানন্দ মহারাজ ও প্রেমনন্দ মহারাজ তাঁকে পাঠালেন জগন্নাথের নবীন সাধুতা দেবীর কাছে জয়রমবার্তা। সংঘ-জন্মনীন পরম আদরে সহানুভূতি বরণ করলেন, দীক্ষা দিলেন। ‘যমেজৈস্বর্যু তুমি লাভাব’। তাঁরপর বৃহস্থানী পাটুলঘর মহারাজ আশ্রমরণের কার্যক্রমে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ‘প্রহ্লাদ’ মহারাজ বলে তিনি পরিচিত ছিলেন। পূজ্যপাদ বৃষানন্দবী মহারাজ অন্ত দিনের মধ্যে মহারাজে আসেন। একদিন তিনি প্রোত্ত মহারাজকে ডেকে বললেন, Prabhu, I shall make you a real prabhu (প্রোত্ত তোমাকে আমি সত্যি সত্যি প্রোত্ত বানিয়ে দেব)।

১৯১৭ খ্রী ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজ মঠে শ্রীষ্টিবালকের পুনর্জাগরণায় পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁকে বৃহস্থানী দীক্ষা দিলেন এবং নাম দেন সিদ্ধ চৈতন্ত। ১৯২০ সালে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের কারণে তাঁর সমাজ হল ভুবনেশ্বরের মঠে এবং তিনি পরিচিত হলেন বীরেন্দ্রনাথ রাঘবের রাগে।

১৯২১ সালে বীরেন্দ্রনাথবাবু অনুষ্ঠিত আলম মাযাবতীতে কর্মা, পরে কলকাতা শাহার মায়ের, হয়েছিলেন। তিনি দর্শন বড় সুনির্ধার ও সুলেখকও ছিলেন। ব্রহ্মসূত্র, ভগবদগীতা (শ্রীধর স্বামী কৃষ্ণ দীপ সহ) প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিয় অনুবাদ এইচ রচনা করেন।

পূর্বীয় মহারাজ ১৯২৯ খ্রী ব্রাহ্মবৃহৎ মঠ ও মিশনের ট্রাফিক নির্বাহ হন। ১৯৩৭ খ্রী তিনি হৃদীকেশে স্বামী এবং এক বছরের বীরী তপস্যা কাটিয়ে সজ্জায় আদেশে ১৯৩৮-এর এপ্রিলে ফিরে আসেন সজ্জার মূলকে বেলুড়ে এবং সেখানে সংঘ মঠ মিশনের অন্তর্ভুক্ত সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সহ-সম্পাদক রূপে মিশনের স্নাতক কার্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপর দান হয়। ১৯৪৩-৪৫ খ্রী অবিভক্ত বাংলায় যে ভাষায় তিনি সাহিত্যিক দেখা দেয় তার সৃষ্টি সাহিত্যিক পূজ্য মহারাজের অবদান বিশেষতায় সমর্পিত।

১৯৪১ এপ্রিল থেকে মার্চ ১৯৫১ পর্যন্ত, তৎকালীন সাধুসাধন সম্পাদিত পূজ্যপাদ মাধবানন্দবী মহারাজের অনুমোদনের কারণে তাঁর সহায়তা পূজ্য বীরেন্দ্রনাথবাবুর সাহিত্য ও সাময়িকীতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কালার্জনের অংশ হিসেবে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৬১ খ্রী এপ্রিল থেকে। ১৯৬৬ সালে সংবাহীন হবার পূর্বে সাহিত্যিক পর্যায়, তাঁর পদে আবিষ্কার ছিলেন।

১৯৫৩-৫৪ সালে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্যাপন এবং ঐ উপলক্ষে নবীনীর আকাশগুণা মেয়েদের জন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠা বিবেচনায় তিনি ছিলেন অন্তর্ভুক্ত শ্রীরামচন্দ্রের প্রচুর মেহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ নগদীয়দের প্রচুর মেহ তাঁর লাভ করেছেন। অগ্রাম আশ্রমের এক ভাংরী, নিয়ে পরম পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী শ্রীশন্তানন্দবাবুর সহ তাঁর মধ্যে জলদের কথা ইতিমধ্যে পুষ্টিকায় মুভিত হয়েছে। পূজ্যপাদ বাবার (অক্ষুণ্ণনন্দবাবু) সহে আপ্রভ একটি ঘটনাবাদ্য বিবরণ এখানে সহজে করছেন। ঘটনাটি ১৯৩৪ এর শেষের দিকের। ববর মঠ মিশনের প্রেসিডেট হয়েছেন ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে। কিন্তু সারাদিন তাঁর প্রিয় সাধন পীঠ। সেখান থেকে অসাতে চান না। আমেরিকার
কয়েকটি মহিলা (ধীরা বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের জন্য বহু অর্থ দান করেছিলেন) যাদের একজনকে বাবা অল্পপূর্ণ। নাম দিয়েছিলেন, তারা বাবার অভিলাষের সঙ্গে কলকাতায় আসেছেন। তারা বাবার সাক্ষাৎ প্রথম। কাজেই মঠ কর্তৃপক্ষ পৃথ্বী স্মারক শাস্ত্রীবাসনার্ডী ও বাবার বারেন্দ্রনাথবাড়ীকে সাক্ষাত পাঠিয়েছেন যাতে বাবাকে তারা বেলুড় মঠে নিয়ে আসেন। কিন্তু স্মারক মহাপুরুষ কখন কিভাবে থাকেন, তা বোঝা বড় কঠিন। তিনি বলে বসলেন—‘আমি মঠে গেলে তেমনি আমাকে অনেক নিম্ন কাছানের মধ্যে বেঁধে ফেলবে। আমি সারগাছিতে বেশ ভাল ছিলু।’ এরাও নামোরাও না।

এরা অনেক করে বুঝালেন, তাতেও বাবা রাগে হলেন না। তখন এরা বলতে লাগলেন, “বাবার কাছে এলাম ছি তিনি দিন হয়ে গেল। মঠে গেলে কথা জন্তে হবে—বাবা তোমাদের বোধ হয় খুবই খাইয়েছেন। হাওয়ার লোকে তেমনি তোমরা ওখানে দেরী করেছ। আর এখানে সবাই দেখেছ হাওয়ার মধ্যে বকুনি ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই।” তখন পৃথক পৃথক মহরা খুব হালকালেন এবং প্রায় এক মাস পর্যন্ত মঠের সর্বশ্রেষ্ঠ কার্যকরের ভোগ দিলেন। সেদিন পাসার ভাবো খুব হল।

এদিকে বাবার মন মেজাজ একটি ভাল দেখে তারা আশ্চর্য উপস্থিত একটি বালককে দিয়ে সার-গাছি চেনেন থেকে ছাড়া ফাঁক ক্লাস এবং আর ছাড়াই ইংরেজি ক্লাসের টিকিট কাটালেন। বাবার সামনেই তাদের হাতে ঐ ছাড়াই টিকিট যখন বালকটি দিল তখন বাবা জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার

কি? তারা বললেন ঐ মেলেটি চারখানা টিকিট দিতে এনেছে। এবং আপনার জন্য প্রথম শ্রেণীর একটি বার্তার রিপোর্ট করে এনেছে। বাবা তখন খুবই গতানুগত হয়ে গেলেন; তবে অল্পক্ষেপের মধ্যে হো হো করে হেসে ফেললেন—বললেন, “বুদ্ধিতে পেরেছি যাইহো এ ছেলেটিরই দোষ। তোমাদের কোন দোষ নেই। বেশকথা, এতগুলি টাকা ও পেল কোথায়?” তখন উভয় পক্ষে খুবই হাসাহাসি। বাবা সেবকদের আদেশ করলেন, “আর উপায় নেই, মঠ বাওয়ার ব্যবস্থা কর।”

পৃথক পৃথক বারেন্দ্রনাথবাড়ী মহরা নীচ উনিশ বছর সংখ্যাকর্মের পদ অল্পক্ষেপ করেছেন। —একথা আমারা আগে বলেছি। ১৯৬৬ সালে রামনন্দীর দিন তিনি প্রথম মেজাজকা দেন। তারপর প্রায় ৭৫ বছর নরনারী তার কাছে মেজাজকা গান। কিন্তু অধ্যায়ক পথের সমাপ্তি এবং সে পথে অগ্রসর হবার উৎসাহ তার কাছে যে অগ্রপৃষ্ঠ মাথায় পেয়েছে তার সংখ্যা কে করবে! ১৩ই মার্চ তার কথা মহাসমাহি হয় তখন যে অবিরাম জনস্মৃত বেলুড় মঠে দিকে প্রবৃত্ত হয়েছিলো তার নীয়া। করা বড় কঠিন। এরা ২৫শে মার্চ তার স্থগন মহোৎসব বেলুড় মঠে যে বিপুল জন সমাবেশ হয়েছিলো তার ধীরে দেখেছেন তারা। বললেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মহোৎসবের স্থলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভাব কথার মনোভাবে তিনি জগিয়ে দিতে পেরেছেন।

বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রগুলিতে তার যাওয়া আসা ছিল, সম্পর্ক ছিল মহুয় স্থানীয় মহাসমাহি মহরাজাদের খুব আশ্চর্য চেয়ে দেখতেন, আর তাদের সকল আবাদর করতেন। গত অল্পক্ষেপ পূর্য (১৯৮৪) তিনি বললেন পদার্পণ করেছিলেন। কথা ছিল পা ছুঁড়ে কোন ভর্ত প্রশ্ন করেন না। হাতে কুল

নিয়ে তারা অন্দুরে লাইন দিয়ে লাড়ারাই ব্যবস্থা
করছেন; এমন সময় পৃজ্ঞনীয় মহারাজ নিজেই মঙ্গলের কাছে একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। বললেন, “এখানে আমি একটু বসব, মাঝে দর্শন করলাম—এখন ভক্তদের দর্শন করি।” ভক্তরা সকলে এসে প্রণাম করতে লাগলেন—এবং পাদপ্রস্থর করেই।

শ্রীমং শামী বীরেন্দ্রনাথজীর অধিনায়কত্বের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ ডিসেম্বরে। এই সম্মেলনে তিনি কয়েকটি কথা বলেছিলেন, যা সর্বকালের জন্য অনেকের হৃদয়ে গাঢ়া হয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সজ্জা সম্পর্কে লিখিত ভাষায় তিনি বলেন, “আমি এখানে সজ্জা শরীর বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করছি। সাধারণতঃ স্মার্তীদের সংস্কৃত সজ্জা শরীর ব্যবহৃত হয়। আমি এখানে গৃহী ও অ-স্মার্তী ভক্তদেরও অন্তর্ভুক্ত করছি।” তিনি আরও বললেন, “রামকৃষ্ণ সজ্জা শরীর গৃহী ও অ-স্মার্তী ভক্তদেরও অন্তর্ভুক্ত করছি।”

আর এই সজ্জাকে তিনি আরও বেশী করে স্মার্তীর দরিদ্র-নারায়ণ সেবার দিকে ও পল্লী-মঙ্গল কর্মে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। স্মার্তীর যেসবদিক শ্রীমান মুখোপাধ্যায় স্মার্তীর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য তার অংশ ছিল অনেক।

যুব-সমাজের মধ্যে স্মার্তীর প্রাণপ্রদ ব্যক্তি তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেজন্য এই হৃদয় বয়সেও তার উৎসাহের অস্ত ছিল না। এ বছর ( ১৯৮৫ ) ১২ই জানুয়ারীর তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশন ও সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮০ ডিসেম্বরে। এই সম্মেলনে তিনি সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সজ্জার বিশেষ অর্থ গ্রহণ করতে উদ্দেশ্যে করেছিলেন, বেশী মাত্র শহর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সকল কেন্দ্র স্থানীয় সামাজিক অনুষ্ঠানের অবদান করেছেন।

শ্রীমং বীরেন্দ্রনাথজীর অধিনায়কত্বের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্গত সমাজকে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তারা সময় হলে সামাজিক পরিবর্তন এবং বৃহত্তর শরীরের প্রাণপ্রদ ব্যক্তি হয়ে উঠে যাবে।

“The main points on which he (Swami Vivekananda) stressed for a person to work for the regeneration of India, were character, spirituality, faith in one self and lastly love for all, particularly the great mass of backward people of India who have been neglected and half-starved by the upper class. The task is indeed very great but nothing can stand before a determined will. Everything will come by the grace of Swamiji. So “Arise, awake and stop not till the Goal is reached.”

[ বিবেকদাস পত্রিকায় নোট]
আনন্দময় পূর্ণনুষেন্দ্র

ডঃ সচিবানন্দ ধর

নুপেনদাকে প্রথম দেখি ১৯৪১ ইং সালে।
বেলুচিস্তানে, ছুর্গী পুজোর পূজারী হিসাবে। তখন তিনি ব্রাহ্মণ। আমি এর আগে এমন স্পষ্ট সংজ্ঞায়িত
উচ্চারণে সাবাশীল গতিতে, ধারণাময় চিত্রে ছুর্গী
পূজা দেখিনি। তত্ত্বাত্মক পূজার মন্ত্র এবং কৃত্যের
সংজ্ঞা উচ্চারণ করতে না করতেই পূজারীর মন্ত্র
এবং ক্রিয়া অবিশ্বাস্তভাবে এগিয়ে চলেন।
তখন আমি বিভাগিনির্দেশে প্রথম বর্ষের ছায়া।
পূজার ছদ্মতে বিভাগিনিরই থেকে গিছলাম।
পূজা ভাড়ার এবং প্রাচীন বিতরণারীর কাজে
যোগদানের সুযোগ পেলাম। পূজার অবসরে
নুপেনদার মুখে আন্তর্জাতিক আঘাত আঘাত
তোলা অন্য মহাত্মা হত হত। পূজার মুখে আন্দ্রের দীপ ছাড়া রুপস্থি
কর্মন্ত্র দেখিনি। এর পরেও করেকার তার পূজা
এবং সংস্করণ আকারকে দেখিয়ে এবং সৃষ্টি
তার সৃষ্টি
শক্তি ছিল প্রথম। এর প্রমাণ পাওয়া যেত তাঁর
বুজ্জন এবং কোন বৈদিক আদেল। কালানিসাত
মুখ্য ছিল। চতুর-গীতা-উপনিষদাদি তো বড়ই।
সংস্করণকে কুই ভালবাসতেন। আর শুধু সংস্কৃত
বা কেন?—ইতিহাসের বিশেষ গর্ভ উদ্ধৃতি এত
দীর্ঘকালে যে মানুষের স্বভাব থেকে তা সকলে না
দেখলে বিশ্বাস হত না। একবার উদ্ধৃতি আরম্ভ
হলে রক্ত নেই। চলল একবার পর আর।

মুপেনদার সঙ্গে রাজ্যবিদ্বানের এক রূপাঙ্গনের সেবা
শিবিরে সহকর্মী এবং সহবাসী হবার সৌভাগ্যলাভ
করেছিলাম। ১৯৪২-৪৩ ইং সমেত—দ্বিতীয় মহাকাস্থ
মহাযুদ্ধের সময় ৩কামাখ্য। তীর্থের পাদদেশে পাঙ্কুতে।
তখন মহাযুদ্ধ চলছে। মহাসচিবের রোজার
হতে চলছে। জাপানী এবং নেতাজী রুহানীর
সেনার স্থল পথে মহাসচিব হয়ে কোহিমার পথে
ভারতে প্রবেশ করছে। মহাসচিব থেকে যুদ্ধবিধিতের
ভারতীয় উদাসীন পারে হাঁটার পথে দলে দলে ভারতে
হস্ত করে। পূর্ণনুষেন্দ্র নারী-শিশু উদাসীনের কি অসহায়
বক্সা। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে যুদ্ধ উদাসীন সেবার
জন্ম শিবিরের খোলা হল ডিমাপুরে—পাঙ্কুতে।

নুপেনদা ছিলেন পাঙ্কু শিবিরের অধিনায়ক।

আমি একবার যাই ডিমাপুরের শিবিরে। সেখানে
ছিলেন পূর্ণনীয় হেম মহারাজাজী ( যাঁরি তারাগী-
শরাবন্দ) এবং তখন শিলার আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন
স্বামী জুতেশ্বনন্দন মহারাজ। শিলার থেকে পূর্ণনীয়
ভূতেশ্বনন্দন মহারাজের থেকে ডিমাপুরের সেবার
শিবিরে যান। মহারাজের নির্দেশে এই সব শিবির
থেকে উদাসীনদের খাতা, পানীয়, ঔষধ, বস্ত্র—এবং
রেলের টিকিট বা পাস ( Pass ) দেওয়া হত।
ডিমাপুরে যারা আসত তাদের আয় সঙ্গে সঙ্গেই
পাঠিয়ে দেওয়া হত পাঙ্কু শিবিরে বা তাদের গন্তব্য
প্রস্তুত তরাক।

তখন গোটা আসাম এবং পূর্বাঞ্চলের 'মূলে-

আত্মন প্রিয়নারায়ণ রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, এন পুষ্পা ও এন জঙ্গীপুর গভর্মেন্ট কলেজ, মুরাদাবাদ।
এলাকা লে ঘোষিত হলেও পাঁজুর পরিস্থিতি ছিল অনেকটা শান্ত। এখানে এসে উদাসীরা ২১ দিন বিশ্বাসের স্বৰ্গোপ পেত। রামকৃষ্ণ মিশনের সাব্যের সেহ এবং সেবার উদাসীরা ছুড়ের মধ্যেও সামনা পেত। পাঁজু ক্যাম্পে নুপেনদা ছিল সকল উদাসীর মাতৃস্থান। পর্বতে বিপদ সকল পথে, আহার পানির অভাবে, আমাশয় ও চক্ররোপের (তখন জয়বাংলা জাতীয় বিক্রিত অবর্তমান চক্র-রোপের ব্যাপক অনুপ্রাণ দেখা দেয়) শিকার হয়ে, পরিবারের পরশ্ম থেকে বিচিত্র হয়ে বাবা, মা, শিশু, মেয়ে—যুব যুবতি—এক একজন এমন অস্ত্র উদাসীরা আসতো। তার কাহিনীতে এক একটা ছুড়ের উপত্যকা রচিত হতে পারে। এই সব হতাশ-নিঃশব্দ উদাসীরকে নুপেনদা তার স্থায়ীর সহায়তার সম্পর্কেত। কারণ তারা একটা ছুড়ের পথে অনেক দিন বসে খেলায় দর্শন করতে করতে নুপেনদা সমাজীর অনেক কথা শুনতেন। Kali the mother আরুতি করতেন। পরদিনের সেবা কাঠার করিয়ে সম্পর্কে উপদেশ দিতেন। কেন্দ্রীটির শব্দ—“আয়”-“আয়” (হয় নয়) “বুঝানি রেবা” (বুঝ কিনে কেমন হয় নয়) পুলিশ পুলিশের উচ্চারণ করে আমাকে এবং পাঁজু বা গৌহাটী থেকে আগত স্থানীয় বাসীকে কেঁপে উচ্চারণ করতে। এই শব্দটির শব্দকথা বহু পত্র এবং সাংস্কৃতিক আরাম হয়েছিল।

এই পাঁজু সেবাশিবিরেই তার সাহসিকতা এক মৃদুতার পরিচয় পেয়েছি। তখন যুদ্ধকালীন জুড়োর অক্ষরাজর জন্ম রেল, স্থানীয় ভাষা, বাড়ি, হাসপাতাল সবই ছিল মিলিটারী অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে। অনেক
মনিদরের সকালের চারের আসরকে তিনি আনন্দ
তরপুর করে রাখতেন। চা সম্পর্কে তার কয়েকটি
ছড়া এবং কবিতা ছিল। দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাপ
চা-পানের উপকরিতা সম্পর্কিত এই সব ছড়া।
মধ্যে মধ্যে রসালাপের ছাদে সহজেই এসে পড়তে
ঠাকুর যামীজির কথা—বিদ্যামনিদের আদর্শের
কথা।

বিদ্যামনিদিকে তিনি যামীজির ভাবপ্রকাশের
মাধ্যম বলে ঝুঁকি অপকার চক্ষে দেখেছেন—এবং
প্রত্যেকটি বিচারীর মনে এই ভাবকে দূর করে
দিবার চেষ্টা করতেন। বিদ্যামনিদির অধ্যক্ষ সামী
তেজসনন্দ মহারাজকে তিনি ঝুঁকি অপকার করতেন
এবং অধ্যক্ষ তেজসনন্দন মহারাজও তাকে ঝুঁকি
থেকে করতেন। বিদ্যামনিদের রজত ভক্তান্তীর সময়
আমি ঠিক পুরুর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে। এই
রজতজয়ন্তী উৎসবে কিভাবে সাধারণ শিক্ষার্থী
তুলতে হবে তার পরিকল্পনা দিয়ে আমাদের মত
দূরবীত্ত পাত্রে বিচারীদের অলুপন্থিত করতেন।
রজতজয়ন্তীর কাজে মুশীন্দার উৎসাহ, উপদেশ ও
শ্রম অাদর্শ সঙ্গে সর্বাঙ্গ করিতেন।

পূজনীয় তেজসনন্দন তিরোধানের পরও
tেজসনন্দন স্মৃতি রক্ষা এবং বিদ্যামনিদের
tন্ধার জন্য চিন্তা করতেন, উপদেশ দিতেন এবং
নিজেও যথাসাধ্য করতেন। বেলাবিয়ার অর্থায়ন
হয়েছে তিনি বিদ্যামনিদের উপন্তির জন্য ব্যক্তিত
দায়িত্ব বহন করতেন। শেষের দিকে পর পর
কয় বৎসর তার সঙ্গে সারাধ্য-বহরমপুর আশ্রমে
উৎসবের সমর্পন সঙ্গে করার সৌভাগ্য হত।
শ্রীরীমার সম্রাট সারাধ্য কালীহাট্ট সুখদানন্দনজীর
সঙ্গে তার চুক্তি ছিল যে কর্যকরি সুখদানন্দনজীর
থাকবেন—সেই কয় বৎসরের বারিক উৎসবে নুপেন
dকালে-উপন্থিত থাকতেই ছিল। নুপেন। তার চুক্তি
ভঙ্গ করেননি। আশ্চর্য শরীরে নিয়েছ যেন তি উৎসবে
গেছেন। তখন আমি জগৎপুর কলেজে। দেখতাম,
মৌলিক অঙ্গের ভক্তার কত আগেই সারাৎ
বৎসর অপেক্ষা করে থাকতেন—কেবল তিনি
আসবেন। সাধারণত তিনি দিন উৎসব হত।
(এখনও হয়) তিনি দিনের সভাতেই তার স্বর্গ
বক্তৃত। শোনার জন্য শ্রোতারা শেষের পর্যন্ত চুপটি
কাছে বসে থাকতে ঘটান পর ঘটত। সভার বাইরে
ও তার সঙ্গে আশায় আসতেন বন্ধ ভক্ত এবং
অন্য সর্বালীকৃষ। পর পর কহলি একই কহলি কাছ
থেকে একই বিখ্যাত শোনারা আগে হেন কখনও
শ্রোতাদের আর হয় নি। তার আধ্যাত্মিক
উপলক্ষি এবং সর্বনাশ ভক্তিতে এর যাত্রা।

বেলাবিয়া। কুড়চেস্ট্স হোম—গৌরীপুরের আদি
কুড়চেস্ট্স হোমের পরিকল্পনায় গঠিত। কালীপুরের
সময় কোন ছাড়দের এবং আশ্রম দুরবেশের পুনর্নিমিত
ক্রিয়াশীল সময়ে নুপেন বিশেষভাবে প্রাণবন্ধ করে
রেখেছিলেন। তিনি প্রাক্তন ছাড়দের এবং
অন্য সাধারণের সমস্ত অভির্ভাব করতেন সর্বপ্রাণ
আমাদের দর্শন এবং প্রাক্তন ছাড়দের জন্য। তার
pতের আহ্বান ছিল মাতৃসে নিঃক্ষণ করা বা পুরো প্রতি
মাতার আহ্বানের তুল্য। এ অভির্ভাবে পাপাণ
হবিলাকি গলিয়ে দিত। দাবী না দিয়ে পার্থ
যেন না। আশ্রমদের গৃহগুলী ছিলেন তার কথা
বা দুঃখামাতা। ছাড়দের অন্ধকার ভাবনাকে তিনি
খুব মধুরভাবেই অধ্যাত্মজনের মধ্যে সংক্রান্তি করে
দিতে পারতেন। একথা কলিকাতার কুড়চেস্ট্স হোমের
ছাড়—এই অভির্ভাবের অধ্যক্ষ হয়ে নুপেন নিজেকে
ছাত্রবাসের সঙ্গে এক করে নিয়েছিলেন। তাঁর অন্তঃরের মাতৃপ্রেম, মননশীলতার দীপ্তি, আধ্যাত্মিক ভাবনার সদানন্দতার আমাদের চিন্তাকে আমাদের আচ্ছন্ন করে ধর্ম করেছে।

জীবন মরণের সীমানা ছাড়া যে অধ্যাপক শ্রীবিদ্যাতঃ ঘোষ, এম.এ.

দেখতে দেখতে এসে গেল পুনর্মিলনের দিন। সেই বার্তা নিয়ে এসেছে কিতীনন্দার চিঠি। কোরে-দিনের জ্ঞান বিদ্যার্থী অশ্রমে যাব, সকলের সঙ্গে দেখা হবে, মনে এক ঝলক আমদের আমেজ। কিন্তু তাঁরই সঙ্গে আছে একটি শ্রীশাসন বেদনার সুখ।

মহাপ্রভু স্মরণী ধ্যানাচার্যদের মহাপ্রভু। কাউকে বোঝাও বা কিছু চেষ্টা হয়ে গেনি। একেই কি বলে দেহ-সংবরণ! নাকি—

‘আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো’ এই শব কথা বলে যাব আমি চলে।’

তবে এ নিশ্চয়ই শ্রীশিল্পকের কুশ্ব। তিনিই তে খুশুন-ভব-বন্ধনের হাতে। আর এ যাত্রা নিশ্চয়ই মহর্ষিতাত। শুনেছি সভ্যারীর এই যাত্রার ছুরের কিছু অনেক। তবুও আমাদের অন্তরের অন্তরতম স্থলে বেদনার অমূল্য। তবে এ বেদনা সাংসারিক আলোকিত। কারণ তাঁর সঙ্গে আমাদের সহঃস্র কোন সাংসারিক নিয়মের বা দেনা-পাওনার রিশতে আবদ্ধ ছিল।

সে সর্বনিহিত হয়ে হেম-ভাল বাজাত। সকলের কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর ব্রত। তাঁর লেখা প্রত্যেকটি চিঠিতে এই বাক্যটি অবশি থাকত—

‘মা তোমাদের সর্বাঞ্জীবি কল্যাণ কুশল করে এই প্রার্থনা।’

মনে পড়ল অর্থাত সালের কথা। পাট ওস পরীক্ষার পর কোথায় পড়ব, কোথায় থাকব—এই সব চিন্তায় আছি। কারণ বেলুড় বিভাগের তথ্য সামরিকভাবে খবর হয়ে আছে। বিভাগীয় আশ্রমের খবরে পড়ে দেখেন হাজির। শেষদিন পর্যন্ত যে বাজিতে হাজির, সেই বাজিতে হাজির, কোথায় থাকব—এই বিভাগীয় আশ্রমের খবরে পড়ে দেখেন হাজির। শেষদিন পর্যন্ত যে বাজিতে হাজির, সেই বাজিতে হাজির, কোথায় থাকব—এই বিভাগীয় আশ্রমের খবরে পড়ে দেখেন হাজির।

‘কি সবাদ দুঃখ! ...’ মেন কবলের চেন। আর কথার মধ্যে এমন একটি বিশ্বস্ততা এবং নিশ্চিত যে আমি নির্ভর বিদ্যার্থী আশ্রমে থাকা আবেদন জাতাল। অবশেষে ঠাইও পেয়ে গেলাম আশ্রম। এইটিই আমার জীবনের এক মাত্র প্রাক্তন বিদ্যার্থী।
নবকাওয়া। এবং তা হয়েছিল পুজোনীয় মহারাজের
অংশীদার। তারপর সাংসারিক জীবনেও:
‘কখনো দিন এসেছে গ্রান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাজ্য,
গ্রানিভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময় অবসাদের অপরাধে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে’
মহারাজের মেহধার। সব গ্রান হুঃ মৃদু গেছে।
মন আবার উদ্বিভিত হয়েছে নিত্য কাজে।
রামকুমার মাটি ও মিশনের প্রাচীন এবং মহান
সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন অসাধারণ। কিছু তা
সত্যের শুক্র তথ্য এবং তথ্য অপেক্ষা তার জীবনে অধি-
কতর মূর্ত্তি হয়েছিল সাক্ষীকরণ কুত্তি, অগাধ বিখ্যাত
এবং প্রত্যাশাহী উন্নত ভালবাস। তাই হয়তো
‘ফরিদপুরের বীরবাবু’র মধ্যে ছিল মাতৃভাবের
জোয়ার। তিনি ভগবানকে মা বলে ডাকতে চেয়েছিলেন।
প্রথম করেছিলেন পৃথিবীর শিবানন্দজীকে
—‘ভগবানকে কি ‘মা’ বলে ডাকা যায় না?’
দ্বিতীয় সময় পেয়েছিলেন মহারাজের কাজে—
‘কেন যাবে না? ঠাকুরের একটি খুব Prominent
ছিলোঃ।’ (বিভাষায়, ১৯৮৭, পৃথিবী—১৩)
কৃষ্ণবাজরীকেও তিনি বলতেন, ‘দাড়িওলা। ৩মা
কালী।’ তাই হয়েছে এমন একটা কিছু ছিল যা
মামলছে কাছে চানত। তাই সম্ভব কথা বলে মামলা
পেয়েছিল তরল আনন্দ এবং প্রাণের আরাম। গুরুগীরীর
আলোচনায় শুধু করতেন এমন নয়। বরং কথা
আরম্ভ হ’ত’ হলুদ চাল। ‘কি খেয়েছিল আজ?’
‘কি রাখা হয়েছিল?’ ‘কি মাছ ছিল?’ ইত্যাদি।
শেষ হ’ত হয়তো ৩মা কালীর রূপের ব্যাখ্যায়।
অসম্ভব বুদ্ধিক ছিলেন। প্রত্যেকের অনুভূত অনুভূত
সব নাম দিতেন। এগুলি ছিল তাঁর মেহ-চিহ্ন।
এই নামেই ডাকতেন তিনি। কত যে মজার মজার
গলা করতে পারতেন তাঁর ইয়াতা নেই। তার
পূর্ববদ্ধীরের সমস্ত মন্ত্র ( উগ্রহো প্রচণ্ড ‘চ চলো
চন্দ্রীকৃৎ ইত্যাদি )। উচ্চারণে হোক, আর অন্য
কিছুই হোক। আর এই সব গলার সময় যখন
যেনটি দরকার নেইমাত ‘বাঙ্গাল’ ‘উড়িয়া’ প্রকৃতি
ভাষার এই নিঃকুঠীতে ব্যবহার হতে পারতেন যে
অবাক হতে হয়। আর একটা বিষয় সবিশেষে লক্ষ্য
করতাম। আলোচনা বা গলার প্রাপ্তিকে তিনি হেলে-
বেলায় ছা। থেকে আরস্থ করে রামায়ণ, মহাভারত,
গীতা, চণ্ডী, রবীন্দ্রনাথ, জামীলী—সবই হবে আহ্বায়িক
করে যাচ্ছেন। কি আলোক-সামাজ প্রতিভা এবং
সৃষ্টিরক্তির অধিক ছিলেন তিনি! তাঁর এই
সৃষ্টির কথা আমাদের সকলেই জান। এবং ইন্দীরীর
বেলটো। ছিলেন ইন্দীরের স্যাকে। কিন্তু ভাষায়,
সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য প্রভুত তাঁর দখল দেখে
আশ্চর্য হতাম। আমি সংস্কৃত পড়েছি। সংস্কৃত-
জীবীও বড়। তবে তাঁর সঙ্গে যখন আলোচনা হত
তখন তিনি এখান থেকে অনর্গল উক্তি দিয়ে
যেতেন, অনেক সময় অন্যান্ত মন্ত্র করতে পারতাম না
অন্নকর করতাম নিজেদের বিশ্বাসের সহিংসতাতে কত-
খানি ছোট! করেকর এই তাঁর কাছে প্রথম রেখেছি
—‘মহারাজ। আপনি এই সৃষ্টিতে রাখেন কি
করে?’ উত্তর হয়ে অপেক্ষা করে আছি কোন
মাত্র মেলে কিনা। প্রত্যেকবারই তিনি উভয়
সেরেছেন গুরুবদ্ধনর মাধ্যমে—“আমরা কাদের
কাছে পাচ্ছি—অধ্যাপক ত্রিপুরারাচক্রভজ্র অধ্যায়
পের মেহদূর রায়ের চোখ, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
মাথুখ। আর তোরা কাদের কাছে পড়েছিস্।”
নিজের কৃতিত্বের কথা একদিনও মুখে আনেন নি। এই প্রকৃত সম্যাসীর উত্তর। শ্বে আচার্য্যতি— ‘আচার্য্যদেব।’ তার জীবন যেন ‘শ্রীশ্রীবান্তলতে জানম’ এর প্রকৃত উদাহরণ।

১৯৪৩’র ২৭শে জুলাইর সকাল। মিলনোৎসব সবে শেষ হয়েছে। তিন দিন খুব আনন্দে কেটেছে। ধীরে ধীরে সকলে আবার নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে আরম্ভ করেছে। পৃথিবীয় দুর্বল মহারাজের ঘরে দেখা করতে গেছি। আরও ছ একজন আছেন। পারা হচ্ছ। কথাপ্রসংখ্যা জেলেন করেছিলাম—

“আপনি রাজা মহারাজকে ( শ্রীবান্তলতে, আমার তুল ধারণ ছিল উনি রাজা। মহারাজের কাছে সম্যাসীর কৃতিত্বের রূপান্তর দান করে রাজা। মহারাজের সমক্ষে কিছু শোনা। ) দেখেছেন?” উনি বললেন—

“মাঠে আসার আগেই উনি চলে গেছেন। তবে একবারে দেখিনি তা নয়। ছবার দেখেছি। এখন বার শ্রীশ্রীবান্তলতের মন্দিরে। সেবার পূজনীয় মহারাজাকে জানাতে উনি বলেছিলেন— ‘ঠাকুর এবং তারা আমাদের জানবে।’ দ্বিতীয়বার রাজা মহারাজের মন্দিরে। তিনি পূজার পর মন্দিরে প্রাপ্ত করতে গিয়ে উঠে দেখি মহারাজ দাড়িয়ে আছেন।’ এ আমার সম্যাসীর নিজের মুখ থেকে শোনা।

আজ অনেককথাই ‘আহ্মগুরং নিয়মে’ বেরিয়ে আসতে চাইছে। শ্বে আমার কেন, নিশ্চয় প্রত্যেক বিধাতাসিক আজ মহারাজের স্বরিত্বের নমি। কারণ প্রত্যেকের সঙ্গেই তা তার আন্তরিক টান ছিল। আমি মিলনোৎসবের প্রাকালে কামনা করি—

’তুমি তোমাদের সর্বোচ্চ কল্যাণ ক্ষুদ্র করুন’

মহারাজের এই প্রার্থনা। আমাদের সকলের জীবনে সর্বদা ঘিরে থাকুক এবং ফলবতী হোকৃ।

স্থূলচিন্তাঃ—বিধাতার আশ্রম

শ্রীতরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী

অন্য অনেক হাতাবাসের মধ্যে Students’ Home-এর তাকাটা কোন জায়গায়। এখানে থেকে সমাজের দরিদ্রতম শ্রেণীর ছেলেরা। শ্বে যে কৃতিত্বের সঙ্গে বিধিবিধানের পারিক সমূহ পাশ করের চাকুরীজীবী হন তাই নয়, তাদের প্রত্যেকের চরিত্রের মধ্যে ৩টি-কৃত্রিম-মানীজীবীর ভাবার অত্যন্ত সৃষ্টিতে ছাপ ফেলে যায়। পরবর্তী জীবনে দেখিয়ি তাদের কাঠে তার কেরে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালিত হইছে।

প্রাক্তন বিধাতা।
কর্মজীবনের অনুপম নিষ্ঠা ও সত্তার সঙ্গে তাদের উপর তাদের কর্তব্য তারা করে যাচ্ছেন, নিজের খাবার হয়ে আশ্রে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। একেই আমরা আজকের দিনের মান-কাঠিন্যের আমর্মণ চরিত্র বলতে পারি—আর এই চরিত্র শৃংখলায় পিছিয়ে নীরবে আজ কোন ধরে করেক জন সম্মানের প্রাক্তন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কাজ করে চলেছে আমাদের বিদ্যালী আশ্রম।

আমাদের শিক্ষার পূর্ণ কথা হোল মানবের মধ্যে মূল্য পূর্ণতাকে প্রক্ষিপ্ত করা, অন্তর্নিহিত অনন্য সত্যাবলম্বীকে বিকশিত করা। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন নিতাসহকারে মনসংযোগ অভ্যস করা, ইচ্ছাশক্তিতে থাকলে নিয়ে আসা। আমাদের সমাজে যে শিক্ষা প্রচলিত আছে তার প্রধান কেন্দ্রটি শান্তিপন্ন লাগানো করেছিলেন। মন নামক এই গুরুপূর্ণ মাধ্যমকে অবহেলা করা যায় না যায় আমরা আন্তর্জাতিক করি। অর তার অবশ্যই পরিপূর্ণ মহীতল গায়ত্রীর অবিরলতার শুটি ফাঁছিয়ে তিনি একদিকে চড়ে Scholar আবার অপরদিকে ইন্ডিয়ার তাড়াতাড়ি নিগৃহীত অহিয়াচিচ্ছ।

অর তার ধর্ম, মহীতল নারদের সম্মানের কথা যেন সর্বাঙ্গকে বেদ ও বিশাখান পরাক্রম হয়ে চিতের অস্ফাল্ত দূর করতে অসমর্থ। মহী সন্তান কুমার তখন তাকে পথ দেখালেন—বললেন যে, তিনি কতকগুলো কথা বা শব্দসমূহ মাত্র শিখেছেন। তিনি মহী নারদের লোকিক বিশ্বাস সাথে সাথে যে বিশ্বাস প্রকৃত স্থায়ী শান্তি লাভ হয় সেই আত্মত্ব শিখা দিয়েছিলেন।

কিন্তু তার জন্য যে ধারনাতমক পরিবেশ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বাতিতে পরিপূর্ণ মানবের জীবন সাধন্য প্রয়োজন সেই প্রয়োজন কোন মামুলী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পূর্ণ করতে পারে না।

আমাদের বিদ্যালী আশ্রমে আমরা এই পরিবেশ পেয়ে ধ্বংস হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে পুরুষীয় মহারাজাদের পবিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে ভরপূর মহান চরিত্রের সাধন্যে এসে।

পূঃ অশেষ মহারাজের বাহিরের আপাত কঠিন শৃঙ্খলাপরিণে জীবনের অন্তর্গত কোমল মানুষের পরশ পেয়ে আমার মত অপরিণামিত বিদ্যালী ধ্বংস হয়েছে এবং তাদের আজান্তে তাদের মধ্যে পূঃ মহারাজের অসামান্য দিয়ে চরিত্রের কোন না গুণ অনুপ্রাপ্ত হয়েছে। অনেক কাজ মহারাজের প্রত্যাশা অনুসারে চুক্তারুপে করতে পারিন বলে বকুনি খোদিয়েছি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার মহারাজ অনুসারে হুকুম ছেদন নিয়েছেন।

এই পুণ্য চরিত্রের সঞ্চালিত করার সৌভাগ্য বিদ্যালীবর হয় না তাদের চিক বলে বোঝান যাবে না এত সাহস। অােক্তায়া তিনি শিখাতেন—হুমায়ুন, সৌজন্য হয়ে বোঝায়, মনকে ধারনের মাধ্যমে নির্দেশ করার চেষ্টা করবি। একথা প্রথম মন কথা জুনে না, কিন্তু তেমন চাঁদরে না।

তিনি নিজে হিরুতে যুদ্ধমন্ত্র না, ধ্বংস হয়ে কোন Oxford dictionary অথবা শান্তিপন্ন কোন রাই পড়তেন—আমাদেরও হিরুতে যুদ্ধ বাবর করতেন এক বর্ষার্থিতায় মন্ত্রে স্থায়ীত্বে যোগ হিঁ নি বোলে মহারাজ রাতের Gathering-এ আমাদের তৃত্তিভাবে বলেছেন—তিনি নিজে ততই ধ্বংস হোক স্থায়ীত্বে যোগ এবং বিদ্যালীদেরও আশা করতেন তার। অনুরূপ কোন তাই তিনি বলেছিলেন: "ঠাকুর-বামিলীর পায়ে আশ্রয় পেয়ে তোমরা জীবন্ত। না করে নেপেন (পূঃ নেপেন মহারাজ ) তোমাদের ভিক্ষা কোনের...
এনে থাওয়াচ্ছে, আজ তোমরা হেলাফেলায় জীবনটা নষ্ট করছ।” কাজ ও কথায় তার কোন কাঁকি ছিল না, তাই তার কথায় এক দুর্দান্ত তেজ ছিল—চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা। যেত না।

সদাহাসময় ও পরিহাসগ্রন্থ পুরোটি মহারাজ এবং বালকবালি ও সদাহাসময় পুরো নেনন মহারাজ আমাদের ছুনের মুখের সকল ছুনের অতিক্রম করার নিশ্চয় প্রেরণা জুগিয়ে চলেন।

কলেজে গুরুর ছুটি পড়ে আসছে—বাহিরের অনেকেই কলেজে যায় না। পুরো শব্দ মহারাজ বোধ নিচ্ছেন—“তরুণ, কলেজে যাচ্ছ কি না?” মহারাজ বললেন—“বে যাক বা না যাক, তোমরা যাবে, দিনগত পাপক্ষ তোমাদের জন্য নয়।” শান্তাবলি যান কথা মহারাজ বুঝিয়ে দিলেন যা হোক তা হোক কোন জীবন কাটান Students' Home-এর ছেলেদের জন্য নয়। জাতীয় চিন্তার বিশেষ বিশেষ দিক গরের ছলে হাসতে হাসতে আমাদের মনে গতিরভাবে একে দিতেন—বলতেন, মনকে Control করাই অসাধ্য কথা, জীবনে সব বাধাকে জয় কোরে নিজের পায়ের লাড়ানর কথা, দৃষ্টভাবে সব সংকীর্ণতা মুক্ত কোরে অভাবী, অন্য-বিধানের, দূর্বল ও পিচ্ছিলে পড়াদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার কথা। পুরো মহারাজ একদিকে চিঠি লিখেছেন, অন্যদিকে আমাদের কথা শুনছেন, তার মাঝে আর একজন কেউ এসে হয়তে অন্য কথা বলতে লাগল। শান্তভাবে সব কিছু কোনে যাচ্ছেন—ননের উপর Perfect Control কি জিনিস মহারাজকে না দেখলে বোধ যাবে না।

পুরো সি—মহারাজ বলতেন—শুধু ভালভাবে পাশ করতে তোমরা এখানে আসনি—সে ভয় আরও অনেক জায়গা আছে। ৩ঠাকুর বামীজর তাংড়ারাকে জীবনে এগুলি করার চেষ্টা করো। পুরো শব্দামহারাজ মিঠি ও ঠাঁপ কথায আদের ( বিশেষ পুরো বড় মহারাজ হয়তে বকেছেন উল্লাস জেনেছেন ) সাতনা ও প্রেরণা দিতে।

একদিন রাতে খাবার খেয়ে কলে জল খাচ্ছে—পুরো শব্দামহারাজ আমাকে বললেন—“আর কাল অতর অধি তোমার ঘরে আসো। জানছি তুমি পড়ছিলে নাকি?” আমি বললাম, “হ্যা মহারাজ—পরীক্ষা এসে গেছে।” “তোমাদের মত এত পরিবর্ত করলে আমাদের আঘাতে লাভ হয়ে যেত।”—মহারাজের এইখানে আমার মনে নতুন চিন্তায় খোরাক জুগিয়েছিল। পড়াশুনা করা ছাত্র-বস্ত্র নিশ্চয়ই উচিত এবং কর্তব্য—কিন্তু তার কেল পরীক্ষায় ভাল result বই তো কিছু হবে না। এমন জিনিস আসার করতে হবে যাবে অপার থাকির অধিকারী হওয়া যায় মনুষ্যত্ব/সাধক ও দস্য হয়—এই ইন্তে ছিল তাঁর অপার Casual কথার গভীর।

আজকের দিগ্রাস্ত উদ্যোগগুলো সমাজে ৩ঠাকুর-না-বামীজর আদর্শ অনুসারে ব্যক্তিগত মন এবং এই আদর্শ অনুযায়ী জীবন গড়ার যে অগুর মূহূর্ত Students' Home-এ পেয়েছি সেখানে আসার সে মনে আমি নিজেকে ভাগাবান মনে করি—তাকে প্রেম, বৈশ্বি ও সেবার অঙ্গনে আদর্শ—পুরো মহারাজ-দের পদপ্রাপ্তে আগ্রহ হয়ে ছুরল স্থূল গল্পের জন্য ৩ঠাকুরের কাছে বুঝতে চিন্তে বারবার প্রশ্ন জানাই।
দেশবন্ধু চিত্রনন্দের বীর-বালক—নুপেন
শ্রীকিতীশ চন্দ্র পাল

ইংরেজি ১৯২১ সালের কথা। ১৫।১৬ বছরের
একটি ছেলে। অসাধারণ বন্ধু। দেশবন্ধু চিত্র-রঞ্জনের বীর বালক নামে অর্থিয়ুগের বিভ্রিবীরদের কাছে যার পরিচিতি। দেশবন্ধু এই বীর বালককেই এরিগে দিতেন বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা। মধ্যে পরাইতনতার উপর বক্তৃতা রাখতে ফরিদগুপ্তের অমে পঁচিক, মাহুরের এলায় স্বদেশ-গ্রেমের সাড়া জাগাতে।

অর্থিয়ুগের বাঙালি বিভ্রিবীরদের অভাব্য জীবন্ত-এই “মুক্তি পথের যাত্রী যাত্রাণা”। তার মনে রয়েছে “দেশের পরাইতনতার উপর বক্তৃতা করে মাহুরের চোখের জল বারাতে বীর বালক নুপেন ছাড়। আমাকে পেয়েছেন বলে সৌন্দর্য যাঁ। নুপেন বক্তৃতা করেন সন্দ্রমাহুরের চোখ (ফরিদগুপ্ত) বড়ো রন্ধনের বাহ। সত্য যাত্রা উপাদান হয়েছিল তার। তারা নতুন অপারেশন চরমে শপথ এবং করেছিল দেশের পারিতন। নুপেনের বক্তৃতা পাশের বিভিন্ন ওকাদ কলামুখায়। প্রেম হলেন নুপেন। ঐ অল্প মাহুরের উদাসন দুর করবার জন্য সরকার কলামুখায় স্কুলের সামনেই বসিয়েছিল প্রশাসন কোটি। নুপেনের সাজ হয়ে গেল। কিন্তু সরকারের উদেশ্য সফল হলোনা। কারণেরে বক্তৃতা নুপেন। নুপেনকে খুনি নিয়ে, তখন দশ দেশ তাঁর মাহুরের একসম্পদে দ্বিক চোখ দীর্ঘকাল বিকির্ণ এবং মহান। উল্লভ যদি দিয়ে এই বীর বালককে জানিয়েছিল সেবার অভিনন্দন।”

এই দেশপ্রেমিক বালক নুপেনই শ্রীরামকৃষ্ণের
ব্যাপারী ধ্যানাত্মানন্দ মহারাজের (নুপেন মহারাজ) নামে সুপরিচিত। রামকৃষ্ণ মিশন (কালিকাতা) ইন্টারন্যাশোনার প্রতি আমাদের ধ্যানাত্মানন্দ তাঁর নিরলস সাধনা, নিঃসার্থ ভালোবাসা ও অপূর্ব মনোমুগ্ধ দিয়ে যে বিভিন্ন আশ্বেনের আশ্চর্যের সেরা
করে গেছেন, পূজনীয় মহারাজ হিসেবে তারই উত্তমতর্ক।

যে দেশপ্রেমিক বিভ্রিক্ষিত বালক নুপেনের বক্তৃতায়
উপনুষ্ঠ হয়ে বহুমাহুরে অশ্রুবার। চোখে শপথ এই
করেছিল দেশের পারিতন, পরিণত বয়সে জীবন সারাফে
সেই মহারাজ দোল পুরুষের পৃথিবী অগ্রগতি
ভবন ছাড়ে ও মাহুরের চোখের জল বহিয়ে ফাঁসুলীর
ত্যগ করলেন।

বিভিন্ন আশ্বেনের ছাত্র হিসেবে তাকে দেখেছি
একচরীরশী শুরু। তাঁর উদ্ভিদীতন ভালোবাসা উদ্ভু
মনে পেরেছি ছাত্রব্যাপ্তি, তাঁর প্রেম পুরুষের
সাংসারিক জীবনে। তিনি তাঁর উদ্ভিদীতন শুরু তাঁর
আলোকে নানা সমাদৃত অতি সহজ সমাধান করে
দিতেন। অতি অসাধারণ জন্য তাঁর সামাধিতে বীরা
এসেছেন, তারই তাঁর অন্তর্বিশ্বাস ভালোবাসা স্পষ্টে
মূল্য হয়েছেন। তারই বুদ্ধ নিয়েছেন পুরুষের মহারাজ
“প্রেমিক সাধু”, যা মাহুরের আকর্ষণ করে, তার
মনের ভারিয়া দেয়।

আশ্বেনের জন্য কালিকাতার চাঁদা সেগু, বেলগুড়
বিশ্বাসিদের অধ্যাপনা, নানা স্থানে বক্তৃতাদান,
আশ্বেষের ভিত্তে নানা কাজে ব্যস্ততা—কোনকিছুই
তার দেহে ও মনে ক্রান্তির ছাপ ফেলেনি। তিনি
থাকতেন আত্মভূত, সদা প্রফুল্ল। খালিগায়ের
বেশীমত থাকতেন, দিনে তিনিয়ার শান করতেন।
১২ কালীপূজার কয়েক মাস আগে থেকেই বিভোর
থাকতেন মায়ের পূজার উপকরণ সংগঠণ। এভাবেই
চলত মায়ের অনুধাবন। বেলুভূত মাঠ দীর্ঘ-দিন
দর্শন পূজা করেছেন। যারাই তার পূজা-তপ্রয়তা
লেখেছেন, তারাই মুক্ত হয়েছেন, পূজার মহাযোগ
উপলব্ধি করেছেন। অজ্ঞাত কর্মধারীর মধ্যে শামি
ধ্যানান্তনদীর শান্তি, সমাহিত, অজ্ঞাত ভাব প্রভৃত
করিয়ে দেয় শামীজীর একটি কথা: "He (The
ideal man) goes through the Streets of a
big city with all its traffic as if he were
in a cave".

শ্রীধ্যানান্তনদী স্তুতি
শামি গর্জানন্দ

নুপেশ্য ইতি নায়া যো হাত্যাতঃ পূজকীর্ষেন।
তর্যধ্যামরনার্তীতি প্রাপ্তি প্রক্রিয়াধিত্ব। ১

শিক্ষাবিব পশ্চিমে বিহীতে মেধাবী ছাত্রবংশেন।
হায়রসিংহিত পূজ্বতক্রমে প্রাপ্তচ্যুম্। ২

তাপস্যা মাতৃভক্তঃ যোগিনং জাপকং সদা।
ধ্যানান্তনদেক্ষেত্রে বনে হি শামীন্দ প্রত্যম। ৩

গ্রাম্য বিবাহী।
গ্রাম্যিক গ্যারিটে
খামি অমরনন্দ

বুধবার ১০-২-৮৬। রামকৃষ্ণ সংগঠনের পৃষ্ঠা অথবা স্বীকার স্বায় মল্লী গান্তীরানন্দীকে প্রণাম করে বিমান-বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম সকাল আটটার পরে। “শিরা সন্ন্য না পশ্চাৎ”—হেই প্রবর্তন উচ্চারণ করলেন সংখ্যাগুলো। সঙ্গে তুষ্ণ সন্তাসী পৌঁছে দিতে উঠিয়েছেন গাড়ীতে।

একটা কথা মনে হোল বারংবার। বিদেশে যায়, ব্রাহ্মণের আচার বিচার থেকে অন্য রামকৃষ্ণের জিনিস তারা দেখে। ফলে, বিদেশকে অভিযাত্রীদের মেহরে দৃষ্টিতে বা বে-পালস হিসেবে দেখে। কোনটি পৃথক কৃষ্টি, কোনটি উৎকৃষ্ট, কোনটি অপরকৃষ্ট—এই ভারতীয়ের জন্য মনে আমার থাকে। আর যেন নিরপেক্ষ অর্ধে সহাইত্বপূর্ণ মনোক্ষেপ থাকে।

ফরাসী দেশের রামকৃষ্ণ সংগঠনের কেলে হোটেলে যাছি। ফরাসীদের চিত্রকলার কিছু কিছু সবাই বাল্যকালেই পেয়েছি। বড় হয়ে ওঠের স্বাতন্ত্র্য, সংগঠন, সাংস্কৃতিক পাকপন্ডিত্য, বেশভূষা এবং বাঙ্গালির মধ্যে একটি কলা-মনক্ষেপ কথা শুনেছি।

প্রথমে ওঠের সান্নিধ্য উপাদান কথা, আমুদা মহান এবং ধোলাচ্ছের কথা। আবার শুনেছি, রোমান ক্যাথলিক বলে ধর্ম-সম্পর্কে ওঠে প্রচারিতমূলক—কিন্তু, তৎসঙ্গে প্রচুর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে কোন অম্বরীয় ব্যাপারে কিছু এবং পৃথক ভিত্তি জীবন-সঙ্গী বা জীবন-সবিনী নিয়ে সংসার পাতেন। শুনেছি, ওঠের ইংরেজি-বিচ্ছেদের কথা। সব মিলিয়ে বলতে গেলে ফরাসী। ফরাসী—

dেরই মন নাছ।

বেলা সাড়ে দশটার কাছাকাছি। দিল্লী আশ্মের

সাহেদর কাছে বিমান-বন্দরের লাঞ্ছ। বিদায় নিয়ে

নানাবিধ তলাসীর জন্য রওনা হলাম counter-এর

দিকে। তেমন কিছু তলাসী হল না। এবারে

waiting room-এ অপেক্ষা। সাহেদর দেশের বিমান

ছাড়বে। বছ ধনী এবং উচ্চ এককে কিউ

দিয়েছেন। Air-bus এ সকলে উঠলেন। এবারে

রয়েছেন বিশ্বের ভাগ জামানী এবং পারিসের যাত্রী।

“কত অজানার জানাইলে তুমি…” কবিতাটাই মনে

পড়লো। কাউকেই খুব সমতত্ত্ব চিনি না। সেখানের

( ফরাসী দেশের ) ক্লাসরুমের দেখেছি কি কথন?

মনে পড়ছে না। তুষ্ণ হইরীভাবে এগিয়ে এলেন

আলাপ করতে। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি এসব

জিজ্ঞাসা। কথার কথায় বললেন তারা যে প্রায়

৩০৭০ বছর আগে বাপ-দাদা তাদের দক্ষিণ আমে-

রিক সুরিনামে গিয়েছিলেন সামাজিক চাকরী নিয়ে,

বছর দশশ হলো। সুরিনাম থেকে হল্যা দেশে

এসেছেন সমস্ত পরিবার। মাতৃভূমি ( উত্তর-প্রদেশের

আদিবাসী তারা ) উপরে টান রয়েছে; তাই

মাঝে মাঝে আসেন। নিজেদের ছেলেমেয়েদের ক্ষুদ্র

ছোটো পাড়াবার ব্যবসা করেছেন। বাড়িতে হিন্দীর

ছোড়েটু হোনের গ্রাম্য সন্তাসী সেবক।
চাঁদ রাখেন; পৃথি ইত্যাদি করেন—যাতে হিন্দু পরিচয়টা মুছে না যায়।
একটু বাদেই দেখি জার্মানী তথা প্যারিসের (ফরাসী উচ্চারণ ‘প্যারি’-এর কাছাকাছি) যাত্রীদের কিউ পড়ে গেছে। Seat allotment বাকি আছে।
আমি non-smoking area, exit area এবং window seat চাইলাম। তখনও। বিমানে উঠে দেখি আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হচ্ছেন এক জার্মানী কর্মকর্তা। জার্মান ভয়লোক বহুদিন ভারতে কাটিয়েছেন বাংলার টানেল তৈরিরু উপাদান। আমার মতনই জানালা দিয়ে বিপুল এ পৃথিবীর অনেক আত্মীয় বিচরণ সত্তার তারা। উপেক্ষা করেছেন।
এক জার্মান ভয়লোক ঘটার পর ঘটা দাঁড়িয়ে রয়েছেন exit point-এ—দৃশ্য উপেক্ষা করেছেন। ৪০ মিনিটের মধ্যে ভারতের সীমান্তের পরিবর্তে পাকিস্তানের আকাশে এসে পড়ছে। মর্মর্মভূমি তথা চাঁদের ক্ষেত—হুই-ই দেখা পাচ্ছি।
এটার ২০ মিনিটের বাদে অফিসে মুলক চোখে পড়ে।
সাজে ছেন লাখ বর্গ-কিলোমিটার জায়গা। এই অফিসে মুলক।
ফ্রান্সের চেয়ে বড়। লোকসংখ্যা পাওনাই ছ' কোটি। পৃথিবীর অন্যতম দেশগুলির অন্যতম। কিছু কী শুন্নার লাগছে আকাশ থেকে হিন্দুর পর্বমালা। দেশের অর্থেক জায়গা। ছয় হাজার ফুটের মতো উঁচু। কোনো কোনো পাথর যে অভি অভ্যুদয়, উপর থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। হিন্দুর মধ্যে সব চেয়ে উচু শৃঙ্গ। নাকি ২৫ হাজার ফুটের চেয়েও বেশী।
জার্মান দম্পতির সঙ্গে ভূগোল পর্যালোচনা করতে করতে সেই অস্বর্ধা ধরিত্রী-থেকে ক্রুতন্তে অতিক্রম করছি। এমন সময় এল খাবার। আমাদের তিনজনেই নিরামিষ খেলাম। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে খেতে খেতেই উঘি মারছি।
একটার একটা নদী গিরিবন্ধ বয়ে এগিয়ে চলছে। দূরে দূরে কি আমু-দরিয়া, আরামের স্রষ্টা অনুভূতি নদী? কে জানে! জানাতে যে বিমানটি ইরান-ইরাকের বিক্ষোভ অকালকে পাশ করিয়ে যাবে।
আমারা জ্যামি কেন্দ্র পাল্পাম, সমাধি থেকে হাস্যকূট পর্যন্ত সোজ লাইম টাঙ্গে মধ্য-প্রায় দক্ষিণে রেখে সেই লাইম বর্বর কাপ্পিয়ারের উপর দিয়ে কৃষ্ণসাগরের পাশ যেঃ রোমানিয়া যায় আমারা সোভিয়েত সুমিতে পরিয়ে; তারপর ক্রমে ক্রমে আসবে হাঙ্গারী, চেকোস্লোভাকিয়া এবং পশ্চিম জার্মানি। পশ্চিম জার্মানির প্রাক্কালে বিমান থামে বিচ্ছেদ।
বন্ধ, পর্বত, উপত্যকা, নদী, অম্বর্গ স্বর্ণ-স্বর্ণপতি মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত হচ্ছে। এখনও সোভিয়েত দেশ চলছে। হঠাৎ আমি বললাম, ‘এই দেখুন! ভল্লু নদী পড়ছে কাপ্পিয়ারেন।’ জার্মান মহিলাটি সুন্দর জানালা দিয়ে দেখলেন একবার। স্বাদিষ্ট শগুর হলো। —‘এই মৌহানায় অস্ত্রারাঞ্জন (Astrakhan) বলে একটা শহর আছে। আমি সেখানে ছিলাম এক বছর রঙ্গ ভাষা সেখানের জন্য। লাইবেরি সাজাতে হয়। সেখান তারা শেখা করবু।’ জার্মান ভয়লোক বললেন, ঠিক রে ঐ কাপ্পিয়ারেন পাওয়া যায় গুরুতর। ওর টিম ‘কার্বিয়া’ সমগ্র ইউরোপে প্রসিদ্ধ।
খুব সুখ্সাব। ছয়েকে বিয়ে, কাপ্পিয়ারে ক্রমেই গুরুতরে বছে।’ আমাদের কাপ্পিয়ারে তখন কাপ্পিয়ার।
আছে, কাপ্পিয়ার তো শেষ হলো; এখনও তো ইউরোপের রোমানিয়া অঞ্চল আসে নি। নীতে দেখা যাচ্ছে বিরাট লবণ মর্মভূমি।
একজন বিমান সেবিকাকে জিজ্ঞেসে করলাম। সে বোঝালা কিছু জানে না।
একজন Air-India staff, পূর্বসূর্য
—তাকে উঠে গিয়ে জিজ্ঞাস করলাম। সে আমার ফুল ভাঙলে। বললে, “আরল সাহাগের পেরিয়ে আমরা চলছি উরালের দিকে। কামিপিয়ান বলে যাকে মনে হয়েছে, সেটা আরল সাহাগ। উরাল আর মস্কার মায়ামাতি জায়গায় ভূগোল নদীর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত হবে।” বেলা সুড় এগারোতে বিমান দিয়ে ছেড়েছে— অতএব সুড় তিনটি নাগাদ আমার। মস্কার উপর দিয়ে যাব।” সিটে ফিরে গিয়ে জায়মান ভ্রমণেরকে বললাম, “ড়া লিঙ্কওত্তস (Dr. Linkwitz), আপনি সুলভ করছেন। অবশ্য এজন্য আমিনি কিছুটা দায়ি।”
কামিপিয়ান আমারা দেখি নি। আমার উরালের দিকে চলছি। বেলা তিনটি নাগাদ ভূগোল দর্শন পাব।”
বিমানের যাত্রী প্রায় গোনে চারশ। প্রায় সকালেই একটা ইংরেজী সিনেমা দেখছিল। আমারা টি-কয়েক পাগল বালি সামান্য ভূপ্রায় জান নিয়ে ভূ-চিত্র দেখতে দেখতে চলছি। কেউ কেউ হেডে-ফোন গান শুনছেন। কয়েকজন উঁকিল এবং একজন জন—সংখ্যার তারা ১১ জন। এসেছেন কর্ণাটক অঞ্চল থেকে। আমেরিকার যাবেন, একটা সমিনার বেগ দিয়েছে। আমার গোমলা বসন দেখে এগিয়ে এসে আলাপ করে গেলেন। একটু বাদই ভূপ্রায় দর্শন পাওয়া গেল, পাতলা মেঝের ছোট ছোট চাপ—তার ফাঁক দিয়ে রুমিগুলো দেখা গেল। মস্কার উপরে যখন বিমান তখন মেঝে চারদিক ঢাকা। ওয়ালসর পর্যন্ত পেছে গেল বিমান, তবু মেঝে কাটছে না। পোল্যাঙ্গের রাজধানী ওয়ালস— সেখান থেকে পূর্ব জার্মানীর উত্তরে রেখে ওয়ালসের দিকে চলছি আমরা। এই সেই দেশ, ভারতের বাতি কোম্পানির আদি মালিক যে দেশে জন্মেছিলেন। চেকরা বলে এই শহরকে ‘গ্রাহাঃ’। একটু
রকম অর্থাৎ ১৭° সে। ফরাশী দেশের মাটিতে পা
দিয়েই একগুচ্ছ নাম মনে পড়লো—বাস্তুল, নেপলিয়া, রাল, নেস্ত্রাদাম্যু, লুকেক, রোমাঁ রোলাঁ। এ প্রেমই, ভিক্তুর, উগো। স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে সাত।
বেলুড়ে এখন গভীর রাত।

আমি এখন প্রবাসী। প্রবাসী বঙ্গ-সত্যায়ন বোধ
হয় একটি বেশী আবেগে প্রবন হয়। আমি তো অপার
থাকে। গড় পড়ু বাঙালীর মনের ভাবাতে কোল-
রিচের ভাবে বলতে গেলে:

“A grief without a pang void, dark
and drear.

A stifled drowsy unimpressed

Which finds no natural outlet, on

In word, sigh or tear.”

আজ সকালে প্রাণের ভাগ ঘরেই রয়েছি।
বাইরে তাপমাত্রা ১০° সে। বসে বসে পক্ষকারের
বৃষ্টি লিখি। প্যারিসে প্রবাসীর আজ চতুর্দশ
দিন—থুড়ি, প্রবল নয়, লো স্তব্ধ—দীর্ঘকালীন
বাস। প্যারিস নয় জায়গাটা—তবে প্যারিস থেকে
শহরের মধ্যে যে রেল মাপ রয়েছে, তাতে আমারের
জায়গাটা পক্ষ বললেই, এটাই ষে বলার যায়। শহরের
পূর্বাঞ্চলে যাবার যে ট্যাক্সি আছে সেখানে তুরন্ত
যাবার ট্যাক্সি হবে; তুরন্তে আগের ট্যাক্সির
নাম হচ্ছে গ্রেটর এম এর। ওটা আল্প যে থেকে
১ মাইল; হয়তো একটি কাঠ হবে। আমাদের দেশের
মিনিটের পথ মাত্র। আমাদের দেশের মাত্র শহরে
যদি পরিচ্ছন্ন, চওড়া রাস্তা এবং মাত্রার
রকমের ট্রাফিক করার যায় এবং মাত্রার
কলরব যদি কম হয় আর থাকে বিশাল ক্ষেত আর
ঘন জঙ্গলের সম্পর্ক, তথ্যপর ঠাপায় আর আবাহোঁয়া—
তাহলে টেস্টের সূত্রিত বুঝতে অসহ্য হবে না।

আমি তো মেহেড়লাম সে-এ-জে (C.D.G.)
বিমানবন্দরে। আদর্শ হতে তখনও ১ ঘটা দেরি।
ঘড়িতে তার সময় রাত ১১টা। ১০ই সেপ্টেম্বর।
মনে পড়লো, ২২ বছর আগে ১১ই সেপ্টেম্বর রেকর্ড
মাঠ দীক্ষা পেয়েছিলাম। কত কাগু ২২টা বছরে—
এদিকে এক ভরলোক দূর থেকে ইশারা করছেন: 
“চলে এলো। কাস্টমসের সামান দাড়িয়ে না”
চলে এলাম বাইরে গুটি গুটি করে। “কী নাম
আপনার?” ভরলোককে জিজ্ঞেস করলাম। “আমি
তো খামো বিষয়ের আদালত। চিনতে পারছেন না?”
উত্তর দিলেন উনি। “কী করা চেনা যাবে সাহেব?
পোশো চামীয়ীদের দেখতে অভ্যস্ত নই, তাই।
আমি ভেবেছি, আপনি হচ্ছেন ডঃ বিলেন্ড্র, আশমের সম্পাদক। কিন্তু, কাস্টমসকে এড়িয়ে আসতে বললেন কেন?” প্রশ্ন করলাম। মুখ হেসে
জবাব দিলেন খামীয়ী, “দাড়িয়ে থাকলে আমরা
শেঠ হবে। অনেককাল ঘরে চেক করবে। দেরিও
হবে তাতে। আমাদের রাতের খাবার সময় হয় হবে।
তাড়াতাড়ি যেতে হবে।” আমি জানতাম, উনি প্রবীণ সম্পাদক।
তাই প্রশ্ন করলাম।
সাহেবি পোশোকে অচেনা এক ভরলোক দূর দাড়িয়ে
ছিলেন; এসে তাড়াতাড়ি ভক্তিভরে প্রশ্ন করল
আমাকে। “কী নাম?” প্রশ্ন করলাম। অবকাশ
হয়ে জবাব দিলেন ভরলোক, “আমাকে চিনতে
পারছেন না? পুরুলিয়ায় গেছিলাম বে কয়েক বছর
আগে।”
আমি হচ্ছি ব্রাজিলীয় দেবচীত্তা। আমিই তো গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাই আশায়। মালপুর সব আমাকে দিন।’’ শহরের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় 5 মিনিটের মধ্যে পৌছে গেলাম। আরও যেতে হবে ১৫ মিনিট—এইবার রুখ হলো। আঁধা শহর। ক্রমে অতি নির্জন ভাষায় পৌছলাম, আবার থানিক বাদে আঁধা শহর। ঠাণ্ডা লাগছে যে অনেক অনেক বলতেই কথাটা, বাঙালির heating machine চালু করলেন। ৮টা ৫০ মিনিটে আমারে এরে করুল্ম। অস্থায়ী নেবেি। বড় জমি-দারার খুঁড়িপূর্ণ মে বাগানবাড়ি করতেন আমাদের দেশে, তাতে আধুনিক gadget সংযোজন করলে যে রকম হয়, সেই রকম হচ্ছে মূল আশ্বাসবাড়িটি।
এই বাড়িতেই শুনলুম, নতুন ঠাকুর-ঘরের উন্মুক্ত হয়েছে জ্যামাহীতী। এই রকমের বাড়িকে ফরাসীরা বলে স্পাইস পালন।

স্পাইস পালন হয়ে দেখি দোতলা থেকে বড় কাঠের সি-ডি বেয়ে নেবে এসেছেন ধাতজানন্দী।
আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং মালা দিলেন গলায় আমার। তত্ত্বা কিছু ফোটো তুললেন। ঠাকুর-ঘরে প্রাত্ম করে থেতে গেলাম তাড়াতাড়ি।

১ ঘাটারও বেশী আশ্বাসবাড়ির। অ্যাপেক্স করতেন আমার সঙ্গে একসঙ্গে সবাই বলে। হরেক জাতের ভিড় এখানে। তাড়ি, জমিজমান, স্পাইনিসন, আমেরিকান, কানাডিয়ান, আর্কিসিয়ান, ভারতীয় তথা ফরাসী।
কাজেই সম্প্রিলিত সুরে গানের “ক্ষুদ্রাপং...ইতাদি” অ্যাক্সিটে হামির মধ্য দিয়ে পাঠ হলো। তত্ত্বাদিক দুর্ভাগ্য ফরাসী ভাষায় পাঠিত “সি দুই দেরিদে...ইতাদি” মন্ত্রটি। আমি কল-কাতায় থাকতে মন্ত্রটি শিখেছিলাম। তাই গড়ু গড়ু করে আগুনে গেলাম। সকলে অবাক। খাবার শেষে শ্রীরূপে মহাকাশী কী জয় ধরনি দিয়ে শেষ হলো।
একজন জিজ্ঞেস করলেন—’কত বেঁচে গেছে বড়িতে?’ ভারতীয় সময় আমার বড়িতে রাত ১টা।

রাতে অর্ধ ঘুম হলো। এখানের স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে চারটায় ঘুম ভাঙ্গলো। ভারতের সময় তখন আটটা। ঠাকুরঘর খুলতে দেওয়া ঘটা এখনও বেশ কিছু পেয়েছে।
ফিদে আর ঘুমের নিয়মগুলো অনেক ধূঢ় দিন সময় লাগল। এই হচ্ছে jet-lag।

‘আর্ট-চোক থেকে রুখ করে তাতালীয়ান পৌলাও (মাসবনাজ) পর্যন্ত হরেক রকমের খানা খাচ্ছি নিত্য।
একজন বাঙালী ভক্ত, থাকেন পারিসে, কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, “মাছ না পেয়ে অশ্বিন হচ্ছে কি? তাহলে আমাকে একদিন আমাদের বাড়িতে!’ জানালাম যে মাছ খাই তবে না পেলে অশ্বিন বা কী-যেন-পাইন গোছের পেলে ভাব হয় না।
নানা জাতের লোকের মজাই নানা রকমের ব্যবস্থা করতে হয় আশ্বামে; তাই ঝুঁকি-ফিরে ফরাসী, ভারতীয়, স্পাইনিসন ইতাদি খানা হয়। হচ্ছেন স্পাইনিসন চেলে রয়েছে আশ্বামে।
তাতে সামাজিক ফরাসি বা ইরেজিজ জানে।
একজন প্রাক্তন জলালীক আছেন সম্প্রতি। মোটামুটি তিনি ইরেজিজ জানেন।
এক বেলজিয়ান বদৌলা, তাই তিনি, আমার সঙ্গে নিজের চেলকে দোভাবে রেখে নানা কথা বলতে চান।
অর্থাৎ, আশ্বাম নিয়ত UNO-এর পরিবেশ।
একটু বললে নিয়ে কি ভাবায় বলতে হয় শ্রী-সুনন্দ-পাঠান-মোগল এক দেহে হোল লিন।’’
সত্যই তাই, প্রাক্তনকাজ বা বেদান্ত বা হর্ষেরভেগ বা ভারত-ঝীতি ইতাদির মাধ্যমে এসে জাড়ো হয়েছেন নানা।
মাহুষ। এই CVR আশ্রমটি সদা-বিবিধ একটি যৌথ পরিবার। সকলে একসঙ্গে বসে খান টেবিলে।

ফুলে-ফলে সুশোভিত আশ্রম। রাস্তা, কাপড় কাচা, হিসেব নিকেশ করা, ঘর সাফ করা ইত্যাদি
সব ব্যাপারে মেশিনের প্রয়োগ। খাবার বা কাজ
করার ব্যাপারে সময়মুল্যবান প্রায় সকলে। তবে
বেশী সময়মুল্যবানতার জন্য ধরের ক্ষেত্রে যাত্রিক ভাব
কিছুটা আসে। একজন ফরাসী জিজ্ঞেস করলেন
আমাকে, “কেমন লাগছে এই দেশ? কেমন
dেখছেন ক্লাসকে?” আমি বললাম, “ক্লাসকে
তেমন দেখছি কই? কিছু ফরাসী খানা খেয়েছি
মাত্র।” বিলেতের মতো ফ্রান্সো কাউকে কাউকে
মোহাম্মর করেছিল আমাদের দেশে। ১৮৭২
সালে বাঙালীর মেয়ে তুম দত্ত লিখেছিলেন কাজ
সম্পর্কেঃ

“Head of the human column, thus
Ever in swoon wilt thou remain?
Thought, freedom, truth quenched
ominous,
Whence then shall Hope arise for us,
Plunged in the darkness all again?”

পাক্ষিকার মধ্যে একটি প্রাচীন কৃষ্ট-সম্পর্ক
দেশকে জানায় আশা। তো অতিরিক্ত উচ্চারণ। তবে
এই যে Bengal আর Goul-এ মিল আনেক।
পঞ্চমৈল বলি এটা লেখা নয় লিপিবদ্ধ বলা।
লিখতে গেলে দৃষ্টি সক্তি চাই, পড়তে গেলেও সেটি
চাই। সে শঙ্কা না থাকার কথায় পারে আস্থায়।
বই পাঠের সূচক সম্পর্কে বিহীন বলা সৃষ্টি-নির্দিষ্ট।
ববিশ্ব জীবনের শেষ কথাটি কবি তার শেষতম
কবিতায় এই ভাবে বললেন তেমন স্বর্ণির পথ
রেখেছে আকৃতি কবি বিচিত্র ছলনা জালে, হে ছলনা-
ময়ী ইত্যাদি। স্বর্ণির এই মায়া প্রক্রিয়াকে মতই
বর্তমান সংস্কৃতির কম ছলনাময়ী নয়। কুলচর্চা
এই বক্তাত্মা সৃষ্টি প্রতিষ্ঠান করলে সমাজ চেয়ে রাখছি।

কালী দেখার কথায় আসি। গত শতকের
পঞ্চমৈল মালে বাল্মীকির শ্যাম-রুলার ঘোষের এক বিশেষ বাঙ্গালী বিশেষ এক কালী
পুজো হয়েছিল। পড়ে ছিলাম তার বিশেষ বিবরণে
চিহ্নিত করে। কারণ শ্রোতা সব কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
কথামূল্য ও ওলা। প্রক্রিয়ার পাঠক মাত্র জানেন।
শ্রুতি একটি দ্রুত করি খয়ে নরেন্দ্রনাথ, রাধানল,
শশী, ভর্মপ্রাপ্ত, গিরীশ প্রমুখ তিন জনের মত বিশিষ্ট
তারাও বর্তমান সে পুজো দেখেছিলেন। কিন্তু
আনুষ্ঠানিক পুজো কী হয়েছিল? হয় নি। কালী
প্রতিমা আনতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেন নি তাই ভ্রমের
পুজোর উপাচার্য সংগঠন করে আরও নির্দেশ এর
অহিম্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সমৃদ্ধ অতি উদ্দেশ্য অপেক্ষা
করছিলেন। বিখ্যাত পন্ডিতের সঙ্গে উত্তরে হয়ে
রাত্রি বাস্তুতো অথচ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কোন নির্দেশ দিতেন
না। আর থাকতে না পেরে পুজো পাত্র থেকে ছুটিত
ভাবে ফুল নিয়ে জের মা বলে গিরীশ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের
পাদ পদ্ধে অর্থাৎ দিয়েই উপস্থিত ভক্তরা সকলেই
দেখলেন তার বিশেষ করা কালী মূর্তি। শেষের
দিকে হাতে হাঁড়ি রেখে ছাড়ি একথা ঠাকুরের।
এই ভাবে আমি প্রকাশ করে এবং তার বিশিষ্ট ভক্ত
দের অভ্য দান করে ঢাকাকৃষ্ণ তার এই কথায় জনমত
শৃষ্টিতেই যেন রাখলেন। ভায হতে তবে অভ্য মাত্রে
নবীন জীবন দানে হে প্রার্থনা রেখেছেন কবি।
বিভ্রম একথা বলার আগে ভাগেই এই ভাগাভাগি।
কালী দেখার হলে কে
কে চাই শ্রীমাতী তা লিখিতেন তার ছুটি কবিতায়।
নাচ্যুক তাহাতে শ্যামায় লিখিতেন, ‘পুজো তার সংগ্রাম
অপার, সদা পরাজয় তাহা না। ভক্ত তোমার, চূর্ণ
হোক স্বার্থে সাধ মান, হদে খাস্তান, নাচায় তাহাতে
শ্যাম। উল্লিখিত ভক্তরা জীবন দিয়ে শ্রীমাতীর এই
প্রেমক্রিয়া মেনে জীবন সফল করে গেছেন।
কিন্তু আমার মত একজনের এর কোটা। আছে যে
কালী দেবের। তবুও দেখতে চাই এই একে এক
মহারাজ রয়ে গেল। একশো বছর পারে এই
শতকের পৃষ্ঠপোষক আমার কালী দেখার কথায়
আসি। কিন্তু সত্যই কে কালী দেখালাম? কথামানে
আমার গ্রামের বাড়ীতে, আমার গড়ে পারিবারিক

পাকন নোত্রানী।
দুর্গ ও কালী হয় পুজোর দৃষ্টি হয়। অমার ডান চোখ আগেই দৃষ্টি হয়েছিল। এক চোখের সামনে দৃষ্টি নিয়ে যান বাহন পাটে পাটে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সম্প্রদায়ের সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে ভয়, সংশয় ও অবিভ্রান্তিকরী অলেক পকেটে নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে গেলাম। নিয়ে আনে দূর্গ পূজা কেঁটে গেল। কালী ঠাকুরের মেজ এক মেজ হোল। অবিভ্রান্তিকরী যে পকেটে ছিল তা জানতাম না। সামনে তুলে আমারিদের ছানা চোখের উপরে দেখতে আমার পেলাম। ডান চোখ আগেই ছুটি নিয়েছে। মৌলুক ভুবন মনে বাড়ী গোলাম, বী চোখে এক ঘোরের মত চলে যাবে শিক্ষক করে বোটানাটকে ছিড়ে ফেললে। ছোটো বলে কলকাতা গিয়ে চোখের ডাকার দেখান, এ আমার কর্ণনার নয়। মান্যজী কালী পুজা দেখতেই। ঠাকুর ছ মেটে হচ্ছে, মান্যজীবনি আমার বাঙালি বয়সের সহযোগী। বললাম তাকে, বুলে পড়ে রেকর্ডার মধ্যে দিয়ে এখনও একটু আঘাত প্রতিষ্ঠাতা রা লাগিয়ে দে। সত্যি বললি তোমার হাতের গুঁ আছে, এমন কালী আমার কথাও দেখি নি।

সেইটেই কি এক মাত্র কারণ? কি জানি পরিবারের এই কালীর সঙ্গে কেমন যেন কট্ট রহস্য-ময়ী আলোকিতার কোন যেন সম্পর্ক আছে। নইলে কেন বারে বারে ছুটে ছুটে আসি। বছর বছর আগে একবার কালী পুজোর দিন গেয়ে আছি অফিসের কাজে। কতৃপক্ষের মানানা মনে রওনা হলম। রাত দেড়টায় নামলাম গ্রামের নিকটবর্তী থানায়।

বাড়ী অবধি মাননী গৌরী অবাধ্য হিসাবে বিপদ নয়। প্রাঙ্গণের মাঝে দুই তুল সারির নীচে বাড়ী শাপাচ্ছে এবং ঠিক তার পরেই শুকনুড়ের আবস্থা তুমি, বুড়া বড়ের নীচে ভাগাঁ। এ সব পার হলেই জঙ্গলাকীর রান্তার্টির এক পাশে সব বর্ষ। চলতে চলতে দুর্যোগ প্রায় যুথ। বছর বর্ষ আসে নবার আলোকিতার আদেশ অমরার গড় রাজ্যের আকাঙ্খিত সভার গুরু নারী ভাইল পপ্তিতকে নিমজ্জন করে এনে হতা। করা হয়। তারপর সত্যিই হয়েছিল তাই নাম সভাবরন। আমে এখানে তুললি হয়েছে অনেক, এখন চলে অবাক ছিন্নতাই, রাহাজান। সরাসরি পারিবারিক ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে কালীর সমান্ত দাঙ্গালাম রাত তখন তিনি তাকাদিবাবু।

পূজা তখনও চলছে যুগাপূর্ব মনের সঙ্গে চলছে বড় বড় শোনা যাচ্ছে। বলছেন সাহস ভাল কিন্তু এমন হয়েছে অমার কোরিনা। ঘোরা, মুখকেশী রূপে মালিনিমুখে হাতে জিজ্ঞে রক্তে মেলে ছাড়িয়ে আছেন। কলিকাতা-তে আছে কালী নারী কেবে বলেছিলেন চাঁদনি সত্যন হতা। করতে। শিবের হাতে শুনে তবেই নারী সংহারে নেমে ছিলেন।

হয় হােতে রক্ত দেখে মনে হোল হয় দুই সমান হলম। তাই চোখের জল মুছে গেলে তুরু হোল রক্ত হাস।

তবু সেই রক্তার মুখে নারী সোনার নিখুঁ হাতে বালি গোলায় হাত পারে হয়পুর। মহামেহ প্রভু। আসি পাশানি শাপাচ্ছ, কিন্তু সাজে বললে এই মাঝে দেখে কেবল ভাঙ্গার কালী কামিনী, যেন আমাদেরই পরিবারের কোন নিজের আর্য্যা। মনে পড়ে এর দশ বছর পরে উনিশের অপরাজিত তে বসের নিষেধ আমার করে যুগুড়া সিমলায় থেকে পালিয়ে এসেছিলাম এই কালীকে দেখাকি। বলে। এদিকে কালী যে এখন রা মাঝে নি। ভাঙ্গার বললে কালীর জন্য রা আপনার চোখে, কালী গুলুকুন, আপনি কাল কলকাতাবাণ। বালকেন কালী এলাম।
কলকাতায়। ডাক্তার-রা দেখলেন শেষে শিয়ালদার নীলরতন হাসপাতালে ভর্তি হলাম। অপারেশন হয়ে গেছে, চোখ বাঁধা মনের সহ সীমানায় একের পর এক বিনির্দেশ ঢোকাত্তে। পৃথিবীর ব্যস্ততম রেল শেষনের অঞ্চলে প্রায়শঃ হাটে গেছে পার্বত্য মুখে। প্রাচীরের সামনে সাহায্য করে ছাড়া বেঁচে তারা। শহরের চকচকে আখ্যায়িত।

পরম পূর্ববর্তী মুগ্ধনাদা শিয়ালদহ না বলে কেন যে শৃঙ্গালকুণ্ড বলতেন তা যেন হাড়ে মজার টের পাচ্ছি। শিবালের বংশধর যেন আর থাকে না। বলেছিলেন কবি তোমার শাশ্ন বিচর্ণ দল, দীর্ঘ নিষীঢ় ভুতাশ্চু এই অধর লেখিয়া। লেখিয়া উঠিয়া ফুকারি ফুকারি। গুঁজো করিয়ে হতে গেছে, গঞ্জ যাত্রায় বিমূর্ত সার্বজনিন পাকার থুলো। মেঘ এখনও মঞ্চে মঞ্চে। এবার তাঁরা যাচ্ছেন সঙ্গে তাঁর কিছুই দল, এক হাতে রোম। অন্য হাতে বোঝাল। ট্রামের তুলনা তুলনা কলকাতারদের চিকার হয়ে শাখানী। তাই চিকা করে, তোমার আওয়াজে আঁকাশ বিদীর্ণ। চিকার গেটেও, কারা এলা ত্রিতলে, শোনা গেল এসেছে তাঁরা বোঝার আয়তে চোখ যাদের উপড়ে গেছে। নীচে বড় গেট দিয়ে যাচ্ছে তারা ঘরে নয় শুশ্রুণ।

এই কী কালী যার সংস্কারে বললেন শাখামীরা রোগ, শোক, ছুঁক মহামরী বিষকাণ্ড তাঁরি বিচর্ণ জনে জনে। মাতুু ধরা নিজস্ব পাল্লাসে তিনি যেন এখানেই মুর্তে হয়ে আছেন। এই তো আমার নিজে দিনের এখানকার অভিজ্ঞতা। চিকিৎসায় অন্ডার সংবর্ণ পাত্র খলি করতে করতে অদ্ব্যায় আঁক।

তবে কী কালী দেখলাম?

আবর্তন

শ্রীবিনোয়েন্দ্র সেন

প্রায় দশবছর ইন্ডিয়া হোমের দিকে যাইনি। কিছু প্রয়োজন দেখা দিল। সিদ্ধেশ্বর দা, শিবন দা ও শিবদাসদার সক্ষম নেই আসাউল। শিবন দা জিডিভির মিলনোৎসবের ( এবার ঠাকুরের ১৫০-তম জয়মণ্ডলী) পাঠানি দিলেন। ‘বিন্দাবান’ স্বরাষ্ট্রাধির জন্য কিছু লেখাই আমার ঈশ্বর। স্বরাষ্ট্রাধি অন্তর কথা সম্পর্কে কিছু মূলত। যে ‘বিন্দাবান’তে ইন্ডিয়া হোমে থাকা। কালে বেশ কিছু রচনা, কবিতা লিখতে হলো এবং কবিতা এখন আজ এতদিন পরে সে ‘বিন্দাবান’তে লেখা পাথানোর ইচ্ছা হল। অর্থাগাঢ় এবার মুগ্ধনাদা নিয়ে, আলট ধরার গেছেন তাঁরা কিছুটা বিচর্ণ। তবে সমস্ত স্বরাষ্ট্র ত ‘স্বরাষ্ট্র’। মন থেকে ছাড়তে হবে, তাতে অন্তরাধিকরণ কথা আসতে পারে; মুগ্ধনাদার কথা কতকটা জানতে পারবে, তবসা।

প্রণীত ছায়া
কম কেনা কারও close associate ছিলেন না নুসেনা। অন্তত আমাদের কাছে। টুডেটস হোমের একটি বিলু ভাষা পৃথ্বীর অনাদি মহারাজের আমি ঘনিষ্ঠতম সামাজিক পেয়েছিলাম। আমি যখন বালক তখন পৌরীগুলো মহারাজের দৃষ্টি পড়ে আমার ওপর, নয়োদ্ধী—আমাকে বসিয়ে দেওয়া হত সারাটি বাণী কালীকীর্তিনের প্রথম সাধিতে। পৃথ্বীর অনাদি মহারাজের একথানি বই আছে ‘Religion and modern doubts’ বইখানির নামের মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত—বইগুলো গোপনে হয়ে রয়েছে—Religion free of superstition, কুস্মারমুক্ত ধর্মচরণ। এটা ত বিশেষ। নিজেদের হল সাধারণ আচার আচারের সৌম্য যা দেখা ও মনে জিনিস বিশেষ ও নিজেদের কুল সম্পর্কে সে আলোচনার তত অবসান দেখেছি না। ধর্মচরণের কথাতেই আসে নুসেনদাও কালীকুঠার পুনরায় মুখ্য। আমার মত টুডেটস হোমের আরও যারা দেখেছেন তাদের কাছে তা চির অবিভক্ত। এমন এক অমরা সন্ত্রাস হচ্ছে অনাদি মহারাজের একটি হোমের মাধ্যমেই। মন্দির মধ্যে পাচ যাদীগার এক শিখা, গেট-শিখা-কাসারের ধ্বনিগত ভাষা ময়দা পরিদর্শন, মোহন আর্টি, হেম এম এই জীবনকে শুধু করবেন। তখন ত আমি কানিজকে leading squad যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিবর্তে আমাকেই গাইতে বল। হল নামামি মুক্ত তারিতি।

লেখার সময়ে নাকি কলমকে দুর কাঠার করতে হয়—বাক্যরে এমন কথা না এবং ফেলি যা অদরকারী। রবীন্দ্রনাথের একটি গান আছে ‘আবিজল মুছিয়ে জমনি।’ রবীন্দ্রনাথের ‘সৌনার বাংলাকে যিনি তাচ্ছে চেয়েছিলেন তার শোষনীয় পরিণাম এখনও—অফিসর করতে। সে হল ওডিকার কার বঙ্গ। এই কারণে কেন কত জনীন শুধু আদর্শ জলন্ত তাদের গোটা জীবনই বরফ হয়ে গিয়েছে; কাজেই মুছিয়ে দেওয়ার মত তেমন কিছু আর নেই এই বঙ্গ।

ওরা আমাকে নাসিগ‘ বলতেন—আনাদি মহারাজ, নুসেনদাও খাড়া নাকের জন্য। অবশ্য অনাদি মহারাজ—‘বঙ্গ’ টাইম বলতেন একটি stress দিয়ে।

একজন চেহারায় এবং স্ট্রেসে অভিজ্ঞতা ধরতে, গ্রান্ত কিনা স্থিতিচিন্তা না। কানিজকে আগের ঘটা দুঝরের বেঁধে ছোট গান লাগাতেন। নুসেনদা হাড়ে টচ্ছেন—ওর মনটি তুল করিয়ে দিতেন ভঙ্গলোক।

স্মৃতি কাননে হয় যায়। কারের ধারা প্রবাহিত হয়ে কোথায় মিলিয়ে যায় তার যেমন ঈশ্বর থাকে না। কতগুলি হিসাব যেন কোথায় কিভাবে সাজানো থাকে, কে জানে হয়ত বা থাকে না। পৃথ্বীর অনাদি মহারাজের মুখে গুনে নেতৃত্ব স্থায়ী সংস্কার সম্বন্ধে—একটিতে একটি যারা অন্যের ভাবাবন। আমরা যারা তার সমাধানে একদিনের কথা, আমি অন্য খুবই বিশ্বাস আমি বলতে হয় না। সংঘাতের অভাজ্য পৃথ্বীর নিজেদের বিচিত্রতা পরিপাত এই দেশ-জাতি-মানবের মাঝখানে নিজেদের বিচিত্রতা অপচারকে নির্দীপ্ত রাখার মধ্যে দিয়ে। অনাদি মহারাজ একদিন আমাকে খুব বেশি অস্ত্রঝড় ভাবতেন; সম্মান বা বৈবাহিক পকে রবীন্দ্রনাথের মননীতকে মানানো। সহজ ছিল না। কিন্তু অনাদি মহারাজ তার নিশ্চিতত্বেরর রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্বে মনে নিতে পাচ্ছে হয় মন; বাংলার জীবনের সন্ত্রাসের সর্বতোভাবে দিশারী রবীন্দ্রনাথের এ।
কথাটি আজ সারা জাতির পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান সে হল

‘মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে পাপ’
যে বছর স্বাধীনতা তার আগের বছরের হয়েই হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। উৎস জিন্না, উৎস মুসলিম লীগের প্রথম লড়াই লড়াই পাকিস্তান’ কলকাতার হরিনাথদের বাড়িতে তখন আমার। 

পূর্বদিকে মিনট দশের রাত্তি, খাল্টর ওপারে অগ্নি পুড়ে অগ্নিকেন্দ্র চালাতে। আমাদের কাছেই থাকাকে কিছু মুসলিম, গড়পারের অগ্নিকেন্দ্র কাছে ওরা নগদ।

কিছু আমার। হচ্ছি তার আজ হাতে নিয়ে দরজায় হাঁটে। তেজে আসা মুসলিমনেরা। আমাদের দরজার সমান, যদিও তেজে তেজে তারাতে তাদের সঙ্গে আক্রমণকারী বিপরীত মুসলিমদের দিকে।

সেদিন দরজায় যিনি দাড়ালেন তিনি সূচনায় অশেষ মহারাজ। দরজায় আধারপত্র বসে, খোলা আধারপত্র জড়ে অশেষ মহারাজ; আমাদের কাছ পকের দরজা ভিড়ে সম্ভব হল না।

দিল খোলা পূর্ণীয় আত্মা হিসাবের সূত্র।

তার, খাদি-দাদি-আট আনা পায়ো পাও পাও, এই গলার মধ্য দিয়ে—গলার বিশাল মনে আনতে পারছি না।

'ফ্লেডস্টেন হোমের নীতির কিছু গভীর ছিল। তার বাইরে যাওয়া বড় সহজ ছিল না। আমি গিয়েছিলাম,' হরিনাথ দে রোডের বাড়ির কাছেই ছিল।

ছায়া একার্ড। ওখানে একবার উদয়সংকর তার উপে নিয়ে আসে।

তার লেখারী মুক্তানিতার একটি প্রাদেশিকতে আমি উপস্থিত ছিলাম।

বাইরে বাইরেম রিভিউ সিরির মিত্র সভায় আমি একটি আত্মতর সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ মানতে গেয়েছিলাম এবং উল্লেখ করেছিলাম ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদয়সংকরের অবদানের কথা। পরে একজন অবাক হলাম যখন নন্দীদের বলতে শুম্ভলাম উদয়সংকরের নৃত্য তিনিও দেখে এসেছেন, আমাকে বললেন—'মীরা বিগারিতা ত কিছু দেখলাম না।

ওঁরা ছাড়া আরও একজন নেই, তিনি দ্বারা বিন্দায়ান্ন, পূর্ণীয় নন্দী। নন্দীদের সিদ্ধ নিতে কালীপুজো রুচি সম্মুখ হত না। Poor Nandida—গানের গলা ছিল না একবারে, কিন্তু না শিখে ছাড়ানো না, খাতায় গানের কথা নিয়ে আর আকালেন।

ভূত দেখে দেখে হোমমোনিমায় বাজাতেন, গাইতেন ও। কাছাকাছির মত্য আমিই থাকতাম। ওঁর কাছে আমিই ছিলাম শিক্ষিতার্থ।

প্যারাকট। সত্ত্ব হয়নি ওর পক্ষে, কিন্তু ওয়ার্যাসের অভিনবতা ভূমিসার নয়। ওর চলে যাওয়াটাই সবচেয়ে বেশি আকর্ষিক।

এদেশে এখন আধ্যাত্মিকতার সম্প্রসারণ সত্ত্বেও যুদ্ধ চালেছে। সে সমস্ত ঘটনার উদাহরণ প্রত্যরাখিত হয়। তার মধ্যে উপরন্তু যুদ্ধ কি বাঁধ নেবে সেটা দেখার।

আমার শুধু একটা কথাই মনে হয়, আমাদের ভারতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রূপ আমরা দেখে পাই নি।

কিছু সমষ্টির পালিন্দ্রাকরা ফ্লেডস্টেন হোমের প্রাগ্নে আমার এবং যারা ভবিষ্যদ্বাণির, আমাদের—একটি ভারতীয় বম্বার্কের গোষ্ঠি।—অনেক কিছু নিজের বলে থাকতে পারত, কিন্তু হাতেই গেছে।

কিছু ফ্লেডস্টেন হোম থেকে সেদিন চলে এসে দেখেছে আমি যে ওখানকার সত্যা এ প্রতিষ্ঠাটি হারায়নি।
(১)
অস্মানের চিৎ-সাগরে রামকৃষ্ণ-পুঞ্জ ফুটিল। রে।
নিখিল স্বদেশ বিস্মৃতি করি অপরূপ মুখ্য উঠিল। রে॥
উজ্জলি পড়িল প্রেম-মকরণ
মহাকাদি দিগ দিবস মধুরস্বস্তি
উমতি কি আনন্দ ভূঃ-ভূল রূপে
পীরুষ সন্দ্বানে ছুটিলার॥
শতদল-গর্ভে সে কি প্রেম-সিদ্ধু
আনন্দ লহরে খেলে পূর্ণ ইন্দ্রু
পরিপূর্ণ প্রাণ লভি স্নঘবিন্ধু
ভব-বহ-বঙ্ক তুটিলা রে॥

(২)
মা'গ, শীতলিনী দিনঘ ঠাঁচ। গো।
এ ঘোর সংসারে হংস-অকুপারে তুমি মা জীবন-না আ গো।
মা 'মা' ডাকিলে নাহি রহিপার
বার বার তুমি কল অঙ্গীকার
তবে কি মো দীন আহ্রান কাতর
গুলিনি ন হ আ সাহা গো॥
দেহমন জনে বাসনা-অনলে
প্রাণপন্থ কুরে পড়ি মায়াজানে
অন্তমরুচ্ছলে কে ডাকে বিকলে
জননী, দেখা আ রাহ। গো॥
কোটি কোটি সহতে পূরাইল আশ
কলোনয় গো ন কর নিরাশ
গুলিনাকু করে বহিছি বিস্মাস
স্মৃতিহৃদাবোলা আ সা গো॥

প্রকাশ বিদ্যার্থী।
ফ্যাটিকের জীবিত প্রতিবেদন
শ্রীনৗোমালনাথ ঘোষ, এম.এম.সি. (টেক্সট) প্রথম ভাগ (ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ)

পৃথিবীতে সমস্ত পদার্থ কঠিন, তরল এবং গাসীয় অবস্থার যে কোন একটি অবস্থায় বিভক্ত থাকে। যখন কোন কঠিন পদার্থকে গলান্তের বৈশী তাৎক্ষণিক তাপ দেওয়া যায়, তখন পদার্থটি তরলে পরিণত হয়। কিন্তু, কতকগুলি জীব সলাসাকার পদার্থের বৈশী তাৎক্ষণিক সঙ্গে সঙ্গে তরলে পরিণত হয় না। এরা কিছু অস্বাভাবিক উপাদান যা তরল অবস্থায় যায় এবং সে সাময়িক এরা কঠিন এবং তরল অবস্থায় মত আচরণ করে। এই অস্বাভাবিক উপাদানকে মেসোক্লেজ বলা হয় এবং এই অবস্থায় পদার্থটি সাধারণত চেয়ে আলাদা হয়। এই সমস্ত পদার্থ মাত্র মেসো-ফেজ দুইটি মধ্যে দিয়ে তরলে পরিণত হয় এবং কঠিন এবং স্বল্প উভয়ের সময় দেখা যায় তাদের তরল ক্লাস বা ফ্যাটিক (Liquid Crystal) বলা হয়।

তরল ক্লাস বর্তমান দৈনন্দিন জীবনে এক বড় স্থান করে নিয়েছে। তরল ক্লাস নির্মিত পকেট ঘড়ি এবং প্যাকেট ল্যাজেলেটের বাজারে ছেয়ে গেছে। ঘড়ি যুক্ত এবং মিনিট নির্দেশনা সংখ্যা বা ল্যাজেলেটের গলার ফল তরল ক্লাসের সিগ্নাল প্রদর্শনের (Liquid Crystal Display) দ্বারা বোঝা যায়। L. C. D. অথবা সমস্ত ডিসপ্লে ব্যবহার তুলনায় খুব কম বৈশ্বিক শক্তি গ্রহণ করে।

তরল ক্লাস তরল এবং ক্লাসাকার অবস্থার মধ্যে অবস্থায় থাকে। কঠিন ক্লাসের অনুগুলি বা পরমাণুগুলি বা আয়নগুলি (মেসোক্লেজের বাড়ির একটি ইটার সাথে তুলনা করা যেতে পারে) একটি নিয়মিত ত্রিমাত্রিক বিটারান সাজানো থাকে এবং এর দারাই ক্লাসের বোধিক আকৃতি স্যুটার হয়। এখানে অনুগুলি সাধারণতঃ এক বা একাধিক স্তরে বিস্তৃত থাকে। যদি অপ্রতিষ্ঠিত (unbalanced) বল দ্বারা ক্লাসকে বিস্তৃত করা হয়, তাহলে একিত্ত্বাধপক বল (elastic force) এই বিস্তৃতিকে বাধা দেবে। অপরপক্ষে, যদিও পদার্থের তরল অবস্থায় পদার্থের নির্মমত (Condensed) অবস্থা, এই অবস্থায় অনুগুলির মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট দূরত্ব রয়ে থাকে না এবং এর ফলে ইহু. পাতারের আকার ধারণ করে।

তরল ক্লাস বা ফ্যাটিক সাধারণতঃ তিন প্রকার হয়। যথা—(১) ম্যেক্টিক (Smectic) তরল ক্লাস, (২) নিম্নাঙ্ক (Nematic) তরল ক্লাস এবং (৩) কোলোস্ট্রাঙ্ক (Cholesteric) তরল ক্লাস।

ম্যেক্টিক ক্লাসের অনুগুলি বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন থাকে। এই স্তরগুলির প্রত্যেকে অপর ধরের উপর দিয়ে গড়িয়ে যোগ (slide) পারে কারণ অনুগুলি যে কোন দিকে বা সামনে এবং
পিছনের দিকে স্থানীয়ভাবে চলাচলের করতে পারে, কিন্তু, উপর এবং নীচের দিকে চলাচলের করতে পারে না। অনুগুলির অমূল্য অক্ষের তলের সাথে লম্বা থাকে। এই শৈলীর কেলাসগুলো তরল সাধারণ মত চলাচলে এবং চাটচাটে হয়।

মেকটিককে শব্দটি দীর্ঘ শব্দ এবং ইহার অর্থ সাধারণ। অনেক সাধারণ মানুষ 200°c তাপমাত্রায় মেকটিককে দেহ গ্রেপ্ত হয়।

নিমাতিক তরল কেলাস সর্বাপেক্ষা সরল কেলাস।

এই কেলাসের অনুগুলির অমূল্য অক্ষ পরপরের সাথে সমান্তরাল থাকে। এতে অনুগুলির অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণন পার এবং যে কোন দিক বরাবর বা দৈর্ঘ্যের দিকে উপর এবং নীচ বরাবর চলাচলের করতে পারে। একটি বায়ুমূর্তি অক্ষ (preferred axis) যাকে নির্দেশক অক্ষ বলা হয়, সেই অক্ষকে কেন্দ্র করে অনুগুলির ধ্রুব-কৃত্রিম বিভাগ নিমাতিক অক্ষ কেন্দ্রীয় ঘর্ষণ মধ্যে অসমতায়কতার (anisotropic) যুক্ত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, নিমাতিক প্রকল্প দি-প্রতিসরকার বিশিষ্ট (Birefringent), নির্দেশক অক্ষের সমান্তরাল এবং লম্ব বরাবর সামান্তরাল রবিরক্ষাতি তালাকের ক্ষেত্রে প্রতিসরকার আলাদা আলাদা হয়। তিনি কেলাস শাখা ক্যালসাইট বা কোরাইটি এর তুলনায় নিমাতিক কেলাস আরও দিকপ্রতিসরকার বিশিষ্ট। তাই যখন আদর্শের নিমাতিক তরল কেলাস ফিল্ম, পোলারাইজিং অনুরীক্ষণ যবে দেখা হয়, তখন ইহার আলাকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি অভাব সাধারণ কেলাসের আলাকীয় বৈশিষ্ট্যের জ্যাম। অনুরীপত্তায়, নিমাতিক তরল কেলাসের বায়ুমূর্ত ইকোমিক এবং ডাই-ইলেক্ট্রিক ধর্ম অসমতায়ক।

ইহার আগামী সাধারণ 0.1 পয়জাম, (Poise) যাহা সাধারণ তন্যের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। গুরুত্ব নিমাতিক তড়িৎ অপরিমাপ। খাদ মিশিয়ে নিমাতিক কেলাসকে 10⁻⁴ - 10⁻⁸ ওহম⁻¹ সে.মি.⁻¹ পরিবাহিতসম্পর্ক সাধারণ তড়িৎ পরিবাহীতে পরিণত করা হয়।

কোলেস্টেরিক তরল কেলাসের (ইহা নিমাতিক অপস্থান উপপাদ্য) আণবিক গঠন সাধারণত কোলেস্টেরিল পদার্থের মত হয় (যদিও কোলেস্টে-রিলের কোন তরল কেলাস দেখা নাই)।

কোলেস্টেরিল অনুগুলির অনুরীক্ষণ অক্ষ (Long axis) পরপরের সাথে সমান্তরাল থাকে কিন্তু দ্রুতগতি পরপর সজান থাকে এবং পরপরের উপর ঘড়িয়ে মেটে পারে।

অনুগুলির অনুরীক্ষণ অক্ষ তরলের তল থাকে। অনুরী আকারের জন্য কোলেস্টেরিলের এককের অনু পার্সিবার তরলের অনুরূপ উপর বলারোগ করে। ফলে অনুগুলির অনুরীক্ষণ অক্ষ কুলাকার (Heli-cal) পথ তৈরী করে। এই কুলাকার বিভাগ ধনাত্মক বা পিন্যস্ক আবর্তনবিশিষ্ট হতে পারে এবং ইহা কিছু আচরণজনক আলাকীয় প্রায় দেখায়।

এই গঠন হেলিকল (Helix) পিচের (হেলিকলের পর পর ছাঁকালের মধ্যে দূরত্বকে পিচ, (pitch) বলা হয়) সমান স্থান অনুরূপ পর্যন্তক্রমে আবির্ভূত হয় এবং কেলাস থেকে X-রশিয় প্রায় প্রতিফলন (Bragg’s Reflection) মতই ইহা আলোকের নির্বাচিত (selective) প্রতিফলন দেখায়। পিচ, সাধারণত 4000 A° - 7000A° হয় যেটা আলোর দৃষ্টিগোচর পরিসরের (Visible Range) মধ্যে পড়ে।

তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে যে হেলিকলের পিচ,
স্যোডাটিক দশাপ্রস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

বিজ্ঞানীগণ যদিও তরল ক্যালসাস সমুদ্রের বায়ুতে থাকলে আশা ধরে, জানেন তাপিত এদের বায়ুর সাপ্তাহিক কারণ থাকে। তবে তরল ক্যালসাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আছে, যারা 1) থামো- এফাকাত, (২) কীন্ম ডিয়াডিমেন্ট এবং (৩) বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নির্মাণে।

কোলেস্টেরিকের কতকগুলি বিশিষ্ট ধরনের জন্য তরল ক্যালসাস থামো-এফাকাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ রাইন কোলেস্টেরিকেকে তাদের তরল ক্যালসাস দুর্লভ মধ্যে দিয়ে ঠাঁচা করতে থাকলে এক শরীরের 
উচ্চতর রং বিকিরণ করে। এখানে আপনি জেনেছিলেন যে, তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে কোলেস্টেরিকের 
হেলিয়ানের পিচ, কেমতিদূর্বল করে এবং এর ফলে যদি সাং আলোক এই তরল ক্যালসাস ফিলের উপর পড়ে তাহলে বিভিন্ন তরল দৃশ্যমান রং দেখা যায়।

বিভিন্ন কোলেস্টেরিকের বিভিন্ন রং পরিবর্তন দেখায়।
একটি নিদিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নিদিষ্ট কোলেস্টেরিক 
সরল নিদিষ্ট রং পরিবর্তন দেখায়।
একটি বস্তুর 
উপরাংশের তাপমাত্রা, নির্ভরে তাপমাত্রার সমূহ 
রঙের এই পরিবর্তন ব্যাপ্ত হয়। এই পদার্থকে বলা 
যায় থামো-এফাকাত। কম তাপমাত্রায় রঙের 
দৃষ্টি-পাতিত্ব পরিবর্তনের (Visible Range) ব্যাপ্ত করতে 
10°C তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। তরল ক্যালসাসকে 
সাধারণতঃ কিতান আকারে বা পাতলা ফিলের 
আকারে ত্রৈমায় করা হয়।

চিকিৎসাবিদের থামো-এফাকাত ব্যাপক ব্যবহার 
আছে। শিরা ও ধনমীর উপরের দুই অংশ জায়গার 
তুলনায় কমপ্লেক্স উভয় থাকার জন্য শিরা ও ধনমীর 
অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্য তরল ক্যালসাস ফিলে।

কমলে শুরু করে এবং প্রতিফলিত আলোকের তরল 
দৈর্ঘ্য কমাতে কম থাকে। কারণ পরিসূচনা, কম 
তাপমাত্রায় আপাততঃ বর্ণলীর (spectrum) 
লাল অংশের তরলদৈর্ঘ্যের মত প্রতিফলিত আলো- 
কের তরল দৈর্ঘ্য থাকে এবং তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে আলোর তরল দৈর্ঘ্য আকাশী রঙের তরল 
দৈর্ঘ্যের দিকে যায়। অনেক পদার্থের ক্ষেত্রে এই 
পরিবর্তন ধুম তুলোতাত্ত্বিক হয়।

তাই এর প্রকার তরল ক্যালসাস অণুগুলি চূনটি- 
আকৃতি-বিশিষ্ট, দৃশ্য এবং স্পৃষ্টিত। বক্সনীবল 
(binding force) (যে বল একটি স্তূপের বিভিন্ন 
অংশের আকার করে এবং বিভিন্ন স্তূপের পরমাণুর 
থাকার সাথে আকার করে) বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন মান 
সম্পন্ন। তাই যখন এরকম, ক্যালসাসকে তাপ দেওয়া 
হয়, অণুগুলির মধ্যকার বক্সনীবল দূর্ব হয়ে পড়ে।
অ্যাম্বেশাটার জন্য বক্সনীবল আঁধারি বা তাদের 
তুলনায় একটি দিক বা তাদের বরাবর দূর্বল হয়ে পড়ে।
এখানে ক্যালসাসের অবস্থান স্থান হয়।

যদিও ক্যালসাসটি স্রোতীকৃত হয় এবং যদি অণুগুলির 
মধ্যের বক্সনীবল স্তূপের মধ্যের বক্সনীবলের তুলনায় 
দূর্বল হয়, তাহলে মেট্রিক দৃশ্য মত একটি নিদিষ্ট 
তাপমাত্রায় বর্ণলীর পরমাণুর উপর গড়িয়ে যেতে 
পারে। যদি ক্যালসাসটিকে আরও তাপ দেওয়া যায় 
অ্যাপলির বক্সনীবল যখন দূর্বল হয়ে পড়ে যাতে 
অ্যাপলি তাদের নিজ নিজ স্তূপের উপর দিয়ে 
গড়িয়ে যেতে পারে এবং এরফলে নিমাতিক (Nema- 
tic) দৃশ্যপ্রাপ্ত হয়। যাইহোক, সমস্ত অন্তর্গত 
ক্যালসাস তাপপ্রস্থে নিমাতিক দৃশ্য উপনীত হয়।
এরপর আরও তাপপ্রস্থে নিমাতিক দৃশ্য স্কুল 
তরলে পরিণত হয়। অন্তর্গত ক্যালসাস থেকে
ব্যবহার করা হয়। টিউনারের আকার ও অবস্থান নির্যাতনেও থাকে স্থায়ী প্রয়োগ আছে। ইহা অসংখ্য পদার্থের গঠনগত ক্ষেট্র নির্ভরে ব্যবহার করা হয়।

তবে কালার্সের গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত ব্যবহার হচ্ছে সংখ্যা। নিউক্লোল (digital display devices) এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি ইলেকট্রোপ্লাস্টিক প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে দুটি প্রক্রিয়া হল (1) ডায়নামিক স্ক্যাটারিং প্রক্রিয়া (dynamic scattering mode or DSM) এবং (2) TN প্রক্রিয়া (Twisted Nematic)।

ঝাপালাকা ডাইইলেক্ট্রিকের অসমদৈর্ঘ্যঃসম্পন্ন নিউমাটিক কেলাসকে (যা দীর্ঘ ইম্পিউজিত মিষ্টিত) দুটি অসংখ্য ভ্রাত্রার মধ্যে রেখে যদি একমাত্র ধরনের কমল কমপ্রণালয়সম্পন্ন পরিস্থিতি বিতর্কবৃন্দময় প্রয়োগ করা হয়, তাহলে অনেকগুলি বিস্তারের তাপীয় পরিবর্তনের ফলে মাধ্যমের পরিবাহিতার অসম- দৈর্ঘ্যকারণ হয় যে আঞ্চলিক পৃথিকক্ষ হয় যায়। উচ্চ ভোংকে এই সমস্ত আঞ্চলের উপর প্রায়ুক্তিক ভোংকের জন্য মাধ্যম উচ্চের ছোট হয়। এই উচ্চের আঞ্চলীকৃত অসমদৈর্ঘ্যঃসম্পন্ন মাধ্যম আঞ্চলের দিকে বিকিরণ করতে পারে। এই পদ্ধতিকে ডায়নামিক স্ক্যাটারিং প্রক্রিয়া বলা হয়।

TN ভিস্প্লে প্রক্রিয়া ধনात্মক ডাইইলেক্ট্রিক অসমদৈর্ঘ্যকারণ পদার্থের উপর তড়িৎক্ষেত্রের বিকিরণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। এতে যুক্ত কম শক্তি ব্যবহৃত হয়। বিশেষ তড়িৎক্ষেত্রের প্রয়োগের জন্য এখানে 100 nanoampere/cm² ভিস্প্লে ফ্রেঞ্চ (area) ব্যবহৃত হয় এবং ইহা TN কোষের যুক্ত কম শক্তিসম্পন্ন ভিস্প্লেতে পরিণত করে। অপরদিকে একটি L. E. D. (Light Emitting Diode) ভিস্প্লেতে 1 watt/cm² ভিস্প্লে ফ্রেঞ্চ ব্যবহৃত হয়, যাহা TN কোষের তুলনায় 10,000 গুণ বেশি। TN ভিস্প্লে ডিজিটাল বর্ধিত ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের চেয়ে এতে সুষ্ঠুতা এই যে, এই ভিস্প্লে বিকিরণ আঞ্চলের, স্ফুর্তিলোকের বা ফ্লাক্সলাইটে ভালভাবে দেখা যায়।

আমেরিকার হল্স রিসার্চ ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞানীগণ ডায়নামিক স্ক্যাটারিং প্রক্রিয়াকে কাছে লাগিয়ে 5 cm. x 5 cm. পর্দাসম্পন্ন টেলিভিশন তৈরী করেছেন। অনূর্ধ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তিবিদ্যার আও উন্নতির ফলে খুব পাতলা। পর্দাসম্পন্ন টেলিভিশন তৈরী করা যাবে যাতে বাণী ফেটে ফটোর মত দেওয়ালে TV কে বুঝিয়ে রাখা যাবে।
ধুমকেতু প্রসঙ্গে
গীতালোকরণ মাইতি, প্রথম বর্ষ (পদার্থ বিভাগ) (প্রেসিডেন্সী কলেজ)

“সে যেন এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস এসেছিল হাতে ছেরাও। নিয়ে পৃথিবীর মাঝখানে খুন করতে...রকের মত সে লাল। কত লোক ভালো হয়ে পাপ হারিয়েছে। আরও কত রোগ আক্রান্ত হয়েছে।” ১৫২৮ সালের ধুমকেতুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন ফরাসী সাহিত্য নাটকোয়ার্ড পারে।

ঠাং ধুমকেতুর আগমন দেখে সিজ়ারপট়ী কালপুর্ণিয়া বাবর সিজারকে সাবধান করে দিয়েছিল, “যখন ভিক্ষুকের মৃত্যু হয়, আবার ভিক্ষু হয় না ধুমকেতুতে; নতোমরুল্লে যেন রাজাদের মৃত্যুকেই ঘোষিত করে।” —সেক্সপিয়র।

সত্যই মধ্যযুগের মানুষের কাছে সেইটি বিভিন্ন। ১০৩৬ সালে ক্লার্কের কাছে ইংল্যান্ডের রাজা হারল্যান্ড-এর পরাজয়ের জন্য মামলা ঐ বছরের আদালতে ধুমকেতুতের দায়িত্ব পালন করে। যদিও পৃথিবীর আদিপুরুষ ধুমকেতু ছিল এক অন্যতম প্রাকৃতিক বন্দুক, লোকে ভিড় হত তার রাগে। দীর্ঘ নয় বছর পর আবার তার সাই বিভিন্ন। নিয়ে ফিরে এলে ধুমকেতু ১৯৬৬তে।

শুধু কাব্য মহাকাব্য নয় জাতীয় জীবনে ক্রমে বিজ্ঞানীয় মহাকাব্যের অলোচনা যুগে প্রচলিত হয়েছিল পৃথিবীর বুকে। দিনটা ছিল ১৯৬৬ সালের ১২শে মে। বিবাদ এল বিদ্রোহ লয়ে রাতে তিনটির সময় ধুমকেতুতে তার বিরাট লেখ্য দিয়ে ক্ষণ-কলের জন্য পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে তুলছে। ছড়িয়ে দেবে বিষ্ণুর আবহমণুগলে তার বিষাল গ্যাস লেখ্য, প্যারিস, মাউন্ট মোট পিটেন্সবার্গ, ভিয়েনা সর্বত্র এক বিষাল হ্যা, শুধু মুখে তাকিয়ে রয়েছে মহাশয়ের দিকে। কখন কি ঘটে! সাবধান! কারও মুখে গ্যাস মাঝে, কেউ গিলে একের পরে এক আল্লাতে কেম্বারট টাইমলেট। খরের কাগজের হককারা চিত্ৰকর করে শর্করার কছে সত্য প্রকাশিত টেলিগ্রাম। হুমাবি থেকে পড়ছে লোকে। মৃত্যুর হাতে আর কতদূর?

অভিজ্ঞ করিয়ে করিয়ে হয়ে ঘুম সেই। তারা বহুকালীন চেষ্টা করতে দিয়েছেন আকাশে বায়ুমণ্ডলের সূচনা চাপ ও তাপমাত্রায় মাপার জন্য। লুসেনের স্নায়ু এর উড়াতে রাবে এক অত্যন্ত সহায় ভাইস প্রেসিডেন্ট তো হাঁসন নক্ষত্র ভিক্ষুদেকে নিনে নিজেই ভেসে পড়লেন আকাশে বেলনে করে। লম্বনের টাইমস পত্রিকায় প্রকাশ—স্পেনের ওয়াল্টন গীর্জার গীর্জায় মন্ত্রণপাত চলেছ। চরম নাট্যক গ্যাস ভিক্ষায় প্রমাণ করে অভাবের কাছে। আবার কেউ কেউ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা না করে আকাশহত্যা করে ফেলেছেন।

অবশেষে সে এল। বিরাট লেখ্য থেকে আগমনের ফলকে ছড়াতে ছড়াতে কে বেন পার হয়ে গেল
আকাশের একপ্রায় থেকে অপর প্রান্তে। সারা
আকাশ জুড়েই যেন তার আধিপত্য। বিজ্ঞানীরা
পরে জানালেন, তার লেজ ছিল ২ কোটি মাইল লম্বা,
যা দিগম্ভ থেকে মধ্য আকাশকে গ্রহণ করেছিল।
যাই হোক ভেষও গেল মানুষ। একে অপরকে জড়িয়ে
ধরল রাতের অক্ষকালেই। গ্যাস মাঝে পরে থাকা
তার বাকি হয়তো ছুঁটে দেব না’ তারাও বোকার
হাসি হেসে ঘরে ফিরলেন।

বিপদ তো গেল কিন্তু সদনেই যে যায় না।
কারণ, ১৯শে মে সারা ইউরোপের আকাশ ছিল
ধনমেয় ঢাকায়। ভূমির মাধ্যমে বিজ্ঞানী যেন
সারা আকাশ দিত দিয়ে বিদ্যমান করে দিচ্ছিল।
পৃথিবীর অপর প্রান্ত জানাল—এ যুগে আকাশ ছিল
অসম্ভব রকম উজ্জ্বল। যেন চক্র সূর্যের চারিদিকে
বেঁচেছিল আলোর সভায়—বিজ্ঞানীদের ভাষায় আলোক
ব্যায় (Halos), সম্মত পৃথিবী যার জ্যোৎস্নায়ের
ডুবেছিল।

১৬শ শতকের শেষাংশে ডেনমার্কের বিখ্যাত
নক্তের স্টোকন রাঘে বললেন, ‘ধুমকেতু আসলে
চর্চা, সূর্য, নক্তের মতই সৌরজগতের উপাদান
মাত্র।’ রাঘে থেকে একবার এগিয়ে গেলেন
আইজাক নিউটন ( ১৬৪২-১৭২৭ )। তিনি বললেন,
তার আবিষ্কৃত মাধ্যমিক শক্তি যে শুধু ‘পড়াপড়া
আলো’ যা পৃথিবী বস্তুমূখের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা
নয়। এই শক্তির প্রভাবেই এই তার সূর্যকে
পরিকল্পনা করে। ১৬৮০ সালে আবিষ্কৃত ধুমকেতু
কার্ট (Kirch) এর দৃষ্টিভঙ্গ দিয়ে প্রমাণ করলেন,
ধুমকেতুরাও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। তবুও
হল এদের কক্ষ্যে অনেক বড়। সেরিহিলিয়ানে
( কক্ষ্যের উপর সূর্যের নিকটতম বিদ্যুৎ ) আসতে
এদের কারণে হয়তো হাজার হাজার বছর লাগে।

এইরূপেই অজ্ঞাত ধূমকেতু মানুষের চোখে এক
বার দেখা দিয়ে চিরকালের বিদায় নিয়েছে। ১৯৭০
সালে লেসেছিল বেনেট (Bennet) আর ১৯৭৩ সালে
কোহুটেক (Kohoutek), এদের কক্ষ্যে একই বুধ
যে বেনেট আসছে আবার ১ হাজার বছর পর এবং
কোহুটেক ৫৫ হাজার বছর পর। আলাদার জন
সবচেয়ে ছোট কক্ষ্যে ( ৩.৩৩ বছর ) এর ধুমকেতু
‘এনেকে’।

ইংল্যান্ডের রয়েল অ্যাস্ট্রোনামার বা রাজনৈতিক
এডওয়েল হ্যালি ( জন্ম ১৬৫৬ সালের ৮ই নভেম্বর,
ছেলেমান থেকেই তারা আর নিঃসীম নিখুঁত। নিম্ন
থাকতেন, তাই তার বার। তারা একটি পৃথিবী
টেলিস্কোপ কিনে দেন। ফুল জীবন শেষ করে
অজানাই বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোনামারা। অধায়ন
করলেন বৃহস্পতি ও শনি সম্বন্ধে তার বিষয়
রিপোর্ট। মাত্র ২০ বছর বয়সে দক্ষলাটীকের
বুকে সেট হেলোনা বীরে দীর্ঘ সাধনার পর এপ্রাকাশ
করলেন ৩৪১ টি নক্তের তালিকা। ১৬৮৪ সালে
তার নিউটনের সংস্করণ পরিচালিত হয় ও মাধ্যমিক
শক্তি পরিচালক আদালতের, যার ভিত্তিতে ১৭৮৫ সালে
প্রকাশ করলেন তার “Synopsis of cometary
Astronomy.” ঐ সময়ই তার চোখে ধরা পড়ল
এই ধুমকেতুটি। তিনি বললেন ১৫৩২, ১৬০০ এবং
১৬৮২ সালে সারা আকাশে দাপ্তরিক করেছিল
যারা তারা একই ধূমকেতু। এবং তা আবার ৭৩
বছর পর ১৭৫৮-৫৯ সালে ফিরে আসে। আমাদের
বিশাল তার অবরোধমান, (মূঢ় তুঢ় এই যায়গুলি)।
ঠিক সময়মতেই ধূমকেতুটি আবিষ্কৃত হয়ে তার
অভিজ্ঞ বিশারদ সত্যতা প্রমাণ করল। তাই তাঁর
ধুমকেতু আজও তার অভিষেক নাম বহন করে চলছে মাইলিয়ের ধুমকেতু' নাম নিয়ে। যাকে ২৪০ শ্রীমতী পূর্বে জু মা সিয়েন (szu-ma-chien) বললেন আলোর বীটা'। ১৯৫৬ সালে পোপ যাকে তাতে বৈশ্বব্যের অভিশপ্তপত্রি বলে একবার করে দিতে চেষ্টা ছিলেন। কিন্তু তাতে হালিমার আসা বস্ত হয়নি। সে নিয়মমতঃ ঠিক এসেছে।

ধুমকেতু প্রধানত ধুলা ও পাতার দিয়ে তৈরি জমাট বাঁধা গায়ের পিয়া। বিজ্ঞানীরা যাকে ময়লা তৈরি বিক্রিয়া এবং জমাট সেবা তুর্কা সূত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন ধুমকেতুর কাজ হয়েছিল যখন সৌর নীচারিকা থেকে বিস্ফূর্তি হয়ে গিয়েছিল শূর্বি ও শ্রমণী। অথবা বলা যায় সেগুলো সৌর জগতের এক বিক্ষিপ্ত অংশ। কিন্তু কি আশ্চর্য! এখনও সে গায়ের পিয়া একই রকম আছে। কেউ কেউ বছর যেখানে হোমগুলো ঘন ও কাঠন হয়েছে ধুমকেতুর সেখানে অলিকাপহলো কোন পরিবর্তনই হয়নি। বিজ্ঞানীদের কাছে তাই ধুমকেতু পৃথিবীর অবশ্য তার অগ্নিতর তোলা। অতঃপরে তার প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক উপাদান এর উপর সৌর বায়ু প্রবাহের পরিবর্ত কেমন তা জানতে পারলেন উত্তর হতে পারে সৌরজগতের অনেক অন্যতম সত্য। এগুলো হালিমার ধুমকেতু শুধু বিশাল ও উভ্যবাই নয়, সে সত্যি, ত্রাকিক্ষুঃ নয়। তাইতে সে সবার এত প্রয়োজন।

মানুষের দৃষ্টি কিছু ধুমকেতুর লেজের দিকে। হিসেবে তো ধুমকেতুকে বলে 'পুরুষ তারা।' অথচ ধুমকেতুর কোন নিজস্ব ক্ষুরিয়া লেজ নহে। অনেকের লেজের খাঁজ যার নয়। অার তার জীবনের বেশির ভাগই কাঠে শূর্বি থেকে অনেক দূর, তখন সে গোলাকার বলের মত। আপন কফিধুলে ধুরতে ধুরতে যখন মাথা মায়ের দৌড়তে সূর্যের কাছাকাছি আসে তখন সূর্যের তাপ ও চাপ দেবায়টে লেজের সম্পূর্ণ হয়। আবার যখন সূর্যের ছোড়ে চলে যায় লেজও কিছুটা হয়।

ধুমকেতুর লেজের নানার আকৃতি ও প্রকৃতি। আমাদের কাছে অবশ্য যাদের লেজ বিস্ফূর্ত ও উজ্জল তারাই প্রয়োজন। এই রকম একটি ধুমকেতু হল হালিমার ধুমকেতু। এমন ধুমকেতু আছে যার লেজ আবার হালিমার কিছুতে পরিণত করে। যেমন ১৮৪৩ সালে আবর্তিত এটি করেন, যার লেজ ২০ কোটি মাইল দীর্ঘ, যেখানে হালিমার লেজের দৈর্ঘ্য মাত্র ২ কোটি মাইল। ১৮১১ সালের আর একটি কমেটের লেজের দৈর্ঘ্য ছিল ১১ কোটি মাইল।

তবে প্রাণেকবাস যে সমান লাগ লেজ নিয়ে সে আসেন তা নয়। ২১১০ সালে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন যে পৃথিবীকে স্পর্শ করতে হলে হালিমার লেজের দৈর্ঘ্য কম করে ১৩ কোটি মাইল হওয়া প্রয়োজন, এবং তা হবে। কিন্তু ১৯১৯ সালের ১৭ দিন আগেও কোনোকেন জোড়ার আবার জানানি, যে তার লেজ এত বড় হবে যা যাতে পৃথিবীকে স্পর্শ করে। যা হবে তা লেজের টাইমস পরিকল্পনা প্রকাশিত হয় যে হালিমার ধুমকেতু তা মিথ্যা। প্রকাশিত করে তার লেজ দিয়ে পৃথিবী ছাড়ে গেল প্রায় ২ কোটি মাইল লাভ লেজ করে।

তবুও ধুমকেতু নিয়ে ভয়ে-ভাবনা এখনও আমাদের মনে দাও বেঁধে আছে। বিজ্ঞানীদের ক্রমাগত জন্য হয়ত এমন একদিন আসে যখন এই বিশ্ববিদ্যালয় ধুমকেতুই আমাদের মঙ্গলবাদি বয়ে আনবে সৌর-জগতের বুক থেকে।

SOUVENIR 1986
সৃষ্টিমণি—একটি বিষয়
শ্রীআলিম চক্রবর্তী (তৃতীয় বর্ণ কমার্ড)

কালোহস্তি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধি।
লোকান্ত সমহতু মিহ প্রবৃদ্ধি।

(গীতা ১১ দশ অধ্যায়।)

ইনিমহ হলেন ঝিয় মহাকাল। এই সংহারকারী মহাকালের হাতে পৃথিবীর বহ আশ্চর্য কৌণ্ডিন্যকি নিঃশব্দ, নির্ভার ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে—কোণারকের সৃষ্টিমণির এদের মধ্যে অধ্যাত্ম।

পূর্ব ও সমুদ্র সীমায়িত উড়িয়ার সুস্তানের। তাতেরের শিলা-সংলগ্নতিকে নিপুনহাতে ভাস্যবাদিত করেছে মনিন্দি—দেউলে। কোণারকের সৃষ্টিমণির কলিকাশ্বাগত, ভাস্ক্রি ও শিল্পকলার চরম উৎকর্ষতার এক সফল পরিণতি।

চক্রতীর্থ পূর্বের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত বলে কোণ ও অর্ব সৃষ্টি। এই দুই শনিয়ের সময়ে কোণারক নামের উৎপত্তি হোয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। উড়িয়ার এক নির্জন বালুকাতীরের স্থান কারিগরের বার বংসের অন্যান্ত পরিসমাপ্ত গঙ্গা বঙ্গের রাজা। এখানে নরসিংহদেবের পৃথিবী-পোষকতায় ইহা নিঃসরণ হয়।

উড়িয়ার মন্দিরগুলির গঠনে প্রথমে ‘বিমান’ (প্রথম মন্দির); তার সাথে জগন্ধোহন (দর্শক-দের সারার জয়গাত) ও নৃত্যমঞ্চ এবং সবশেষে ভোগমঞ্চ কিন্তু কোণারকের মনিন্দের পৃথক ভোগমঞ্চ নয়।

কোণারকের মন্দিরটি যেন সৃষ্টিবাহী একটি বিকট রথ। যে এই সাতটি গোসামা বেদিক ছ্বেনের প্রতী বলা হয়ছে। গোসামােগুলিকে গায্যের, উদিস্কি, আন্টারিজ, শুভ্রী, পাক্ষির, তিলুপে ও জগতী নামে সামগ্রে নামকরণ করা হয়েছে। রথটির মাঝে জোড়া কারকার খোঁটি চাকা আছে। হয়তো শূর্ণা দাতাকালীনের প্রতীক হিসাবে চাকাগুলিতে আটটি করে শালাকা আছে। বিভিন্ন প্রকৃতি যুদ্ধের অবস্থায় বিভিন্ন হওয়ায় যাতে সব স্তুতিতেই শূর্ণাদের প্রথমরকম সিন্ধারা দৌরায়মান শূর্ণমূর্তির উপর পড়ের পারে সেগুলো মনোমৃদূর পাশাপাশি তিনটি প্রবেশদ্বার আছে। মনিহার বহির্গতে তিনিস্কের তিনটি পার্শ্বে দিবাতার মৃদু স্তুতির আছে। এই শূর্ণের তিনটি বিশেষ বদল প্রকাশ—প্রভাত শূর্ণের শান্তি ও সৌন্দর্য, মধ্যাহ্ন শূর্ণের কঠোরতা। এবং অক্ষাল শূর্ণের যে রাত্রিবধ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা অপূর্ব। শিল্পীদের হাতে পূজা পার্শ্বের, মূল ফল, লতাপাতা যেন জীবন হয় মনিন্দিকে চিত্রঙ্কন করে রেখেছে। মনোমৃদূরের খোদাই নাৰ্ত্তকী মূর্তিগুলি দেখলে মনে হয় তাদের বাতাসের রেশ ও নুপুর্ব নিৰ্মাণ বৃহিী এখনই থেকে গেল।

কিন্তু একটু প্রশ্ন—মন্দিরটি ব্যাপস হ’ল কি করে? প্রবাদ আছে প্রাচুণ চৌরঙ্ক বক্তিসম্পূর্ণ।
কোন ধাতব পদার্থ দ্বারা গব্যগুণের প্রধান মূলত্বটি গঠিত ছিল। মন্দিরের পাথরগুলি লোহার দৃঢ় দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছিল। মন্দিরের গঠন প্রাণিক একক হওয়ায় গব্যগুণের মধ্যে মূর্তিটি চারিদিকের লোহাঙ্গের দ্বারা সমান বলে আকৃষ্ট হয়ে শুধুমাত্র দোহালামান অবস্থায় ছিল কিন্তু পরে বিদেশী শক্তি দ্বারা মূর্তি লুটিত হওয়ায় মন্দিরটি ভেঙে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এই মন্দিরের উপরের কতকাংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। ১৮৩৭ খ্রীঃ হত ফাগুসন মন্দিরটি দেখেন তার উড়িষ্যা। পরিষ্কার কালে এক ছবি আঁকেন। তখন এর বাকী অংশ ছিল বালি ও পাথরের স্তূপ। ১৯০১ খ্রীঃ থেকে লর্ড কার্জনের অনুশীলনে মন্দিরের সংস্কার শুরু হয় এবং বহু শতাব্দীর পর বর্তমান স্থানে পেল এবং রথের চাকা আবার প্রশ্রয়ের মূখ দেখল। ইহার সংরক্ষণার্থে গব্যগুণের চারিদিকের অবস্থার গল্লোক বালি পাথর দ্বারা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এখনই এর অবশিষ্টাংশ যে কোন স্তরের মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। এখানকার মূক-পার্থা অপূর্ব ছাড়া কথা বলে। এখানকার নারীমূর্তির ঘনপ্লবিত চোখের আকর্ষণ জীবন মানবীর মত—মনে এক অব্যক্ত বিশ্বাসের ভাব এনে দেয়। সত্যই কি এমন কোনদিন ছিল, যখন এখানকার প্রতিটি সকাল সন্ধ্যা আগন্তু তত্ত্বজ্ঞানের বদলে মূর্তি হত? দেবদাসীদের নৃত্য ও সঙ্গীত কি কোনদিন মূর্তিতে করতো? দেবতার হৃদয়ের গভীর অহ্বঞ্চল? কালের কি বিচিত্র গতি?

তখনই মনে পড়েঃ—

"কালোহস্মি লোকভক্তি গৌণুন্দ্রে। লোকান্তর সমহতু মধ্য প্রযুক্ত।"
পরম করুণাময়ী শ্রীলীসারদা দেবী
শ্রীকৃষ্ণ বিহারী দেবনাথ, বি.ই.ই.

পরমহংসদেব শ্রীলীসারদার শীঘ্রভাবেই বেশি কিছু সংখ্যক তারী শিষ্য তৈরী করেছিলেন যারা 'আমনো মোকার্ত্ত জগদিতায়চ' সংসারবিদ্মহ পরিপ্রেক্ষ্যে করে জগতের কলায় কামনায় শ্রীলীসারদার পদ প্রাপ্তে মিলিত হয়েছিলেন। ঠাকুরের ছিলো তাদের আশা ও ভরসার স্থল, তাদের পরম আশ্রয়। ঠাকুরের অন্তর্বাচের পর তারা কক্ষচূড় একের তোর দিয়েছিলে জ্ঞানশৃঙ্খলা হয়ে গেলেন। তারা কোন পথে যাবেন, কি করবেন কিছুই স্ত্রী করতে পারছিলেন না। তাদেরকে সংখ্যক করে তুলছিলেন পরম করুণাময়ী শ্রীলীসারদার পরম স্নেহপূর্ণ আশ্রয় ও অনন্যনিবি করণ মাথা স্নেহা।

শ্রীলীসারদার গর্ভধারিণীর দুঃখ ছিল, সারদার কোন ছেলেপুল হল না। শ্রীলীসারদা ঠাকুর তা জানতে পেরে বলেছিলেন, "ও জন্য আপনারা দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত সত্ত্ব হবে যে মা ডাক গুরু অতিম হয়ে যাবে।" ঠাকুরের অমৃতময়ী বাগীতে আর হয়ে আগন্তু গৃহী ও তারী ভক্ত, তা একদিনে মহার্ষী কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়ক্রু গোস্বামী, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ দত্ত—এদের মত বিষ্ণু প্রতিভা থেকে সুরক করে অপরদিকে লাটি, বসাকে মেধাতে পর্যন্ত স্বর্গভূতের মানব শ্রীলীসারদার চরণপ্রস্থে সমর্পিত হয়েছিলেন। তাদের অনেকের নিকট শ্রীলীসারদা ছিলেন একাধিক নিত্য ও আশ্রয়ের স্থল।

মায়ের দিকে মা ছিলেন সকলের মা, সতিকারের মা, পাতান মা নন। ভক্তদের মধ্যে করে কোন বায়ুম ছিল কিংবা কোন আক্সিমিক বিপদপূর্ণ হল মা তার রোগমুক্তি না বিপদ মুক্তির জন্যে একের উদ্দেশ হয়ে যেতেন। এই মায়েরের ছিল সাধনীর ও পরাঙ্গমণকুল ও এতে কোন করম বিষ্ণুকে স্থান ছিল না। পারের গায়ের মুসলমান আমাজা জয়রামবাহীর মায়ের বাড়ীতে প্রদায় পেতে বলেছে। মায়ের এক ভাইঁক ছেড়ে ছেড়ে যেখানে দুর্গর রেসে পরিবারের সবকিছু ছিল। মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন ও কিরে এ রকম করে দিলিচ্ছ কেন? অঞ্চলকে সাদরে পরিবরা-স্বস্করে বাড়ায়া হয়। আমাজা ভারতীর দায়ে করয়েবার জেলের মেয়াদ খুনেছিল। আমাজাদের মায়ারের পর মা নিজের হাতে ও উদিত পরিবার করলেন। একে কিছু বলতে এলে বললেন, "আমার কাছে চরণ ( খান সারদাসন্ধ, রামকুঃ মিশনের তাতান্ত্রিক কর্মসচিব ) যা, আমাজাদও তাই। এ না হলে মা হওয়া যায় না।" রামপ্রসাদ বলেছেন, "মা ধরিয়া কি মুখের কথা, শুধু প্রসাদ করলেই যায় না মাতা। যদি না বুঝে সত্তানের ব্যাখ।" সন্তানি বিবেকানন্দ পরিবারকে বেশ সত্ত্ব ভারতবর্ষ পরিক্রমণ করে যখন দাস্কালাতে উপনিবে হলেন, তার কিছুদিন পরেই পাস্কাটিয়ার চিকাগো ধর্ম মহাসমারোহ যাবার প্রেরণা এল। মায়ের

প্রাক্তন বিখ্যাত।
রাসীদের প্রথম অনুরোধ এবং অনুমতি সেই পোস্টার করতে না পেরে শ্রীমানীরের অনুমতি প্রার্থনা করে পত্র লিখলেন। মায়ের পত্রোপলে অনুমতি আসার পর শ্রামিকীর ভবিষ্যৎ কর্মপথ নির্ধারণে আর কোন বাধা রইল না।

শ্রামিকী শ্রীমানীকে জ্ঞান দুর্গী বলে অভিহিত করেছেন। শ্রামিকীর ভাষায়-"রামকৃষ্ণ পরমহংস বয় যান, আমি তীর্থ নেই। মা ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ। শক্তির কুপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে?... আমার চোখ খুলে যাচ্ছে। দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মত করতে হবে। আমাদের মা অধ্যায়িক শক্তির একটি বিশাল আসার, যদিও বাইরে প্রতী সমুদ্রের মত প্রশান্ত। তার আবির্ভা ভারতের ইতিহাসে এক নবমুখের স্থান করেছে।"

এবার মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনের একটি ঘটনাবলি আসা যাক। একদা শ্রীমান অতুল বলরাম বসুর বাড়ীতে এসেছেন। দ্বিপ্রায়িক আহারাদির পর শ্রীমান বাড়ীর চাদে আশুনুল্লালিত কুসুমের বনে আছেন চুল গুকোবার জন্য। পাশেই গিরিশ ঘোষের বাড়ী। তিনিও বুঝেছেন খাওয়ার পর সন্ত্রাস ছাড়ে উঠেছেন পায়চারী করতে। প্রথমে গিরিশ পত্রীর জয়া নরস পল্লায় মায়ের দিকে, সেখানে সেই শ্রামিকে বললেন-"দেখ দেখ, মা সরদা এই বাড়ীর ছাদে।" গিরিশ ঘোষ তাকালেন না, অচিরে নাচে চলে গেলেন এই বলে, "এই পরাপুরতা মায়ের দিকে তাকাব না।"

এই গিরিশ ঘোষ একবার মরণাপন্ন অমৃতে শ্যামগত হলেন। বাংলার বিদ্যুমতী আশা নেই। আশীর্বাদ ওঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন।
সমাজ পাওয়া গেল না। কিন্তু খুবটা রামকৃষ্ণের কানে গেল। তখন তিনিই বল দিলেন—“এখানে সেখানে ঘোরায়ির করে কি হবে? দেখে যাও জয়রামবাবুকে মৃদুতরে ‘কুটারী’ আঘাত।” প্রাধান্যের প্রথা অনুসারে গাছের ভাল কল্পিত ভবনের উদ্দেশ্যে নির্দেশ করতে হয়। এখানেও সাধুদাতি রামকৃষ্ণের সমাপ্তি নিবেদিত। ঐহিত্য সঙ্গী হিসেবেই ঐহিত্যই আবিভূতি হয়, আর কেউ হন, আর কেউ নন। তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণগণপ্রাণ, তালামারামপ্রাণ, দ্বারবিহার্য্য, লজ্জাপালন, অন্ততাজ্জীবনের এক সত্বরতা ও সরলতার প্রতিষ্ঠিত।

মায়ের জীবনের সবচেয়ে বেশী বিগতকালের ঘটনা—মহম্মদ বিদেশী তামিল নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও তার আশা রুপে আত্মরক্তার হিত অর্জন। আত্মহিত শাস্ত্রীর এক প্রাধান্যের অধিকারীর কাছে যাওয়ার পথে আসন্নএক বিদেশী নারী সময়, কাল, পরিপ্রেক্ষিত এবং তথ্যকারণ সংক্ষেপের গণ্ডীর বাইরে এসে সাদর অভাবনীতি করার ভুল দিয়ে মায়ের জীবনের উদ্দীপনা বিশ্বাসী এবং প্রাক্তাতের বিদ্যুত তীর্থ প্রতিষ্ঠার অন্তরূপ বন্ধ করে।

মা চলেছেন পার্শ্বী সঙ্গীদের সঙ্গে দক্ষিনেরভের পাতি সন্ন্যাসে। এটি মায়ের তৃতীয়ীবার দক্ষিনেরভের গমন। মায়ের কোমল শরীর পথশ্রমে রাস্তে হয়ে পড়ুল। ছড়া হয়ে আসছে, সামনে তেলেতেলের মাঠ, ডাকাতদের আজ্ঞা দান। ছড়া হওয়ার পূর্বেই এই মাঠ গেরোতে হয়, নতুন সমুহ বিপুলের সন্তান। মা ক্রমগত সঙ্গীদের সঙ্গে গিয়ে পড়ছেন। সঙ্গী এবং সঙ্গ্রিদের তারকে, সবকয় পা চালিয়ে চলতে বলছেন। মা ও আশ্রম চেপে করেছেন কিছু পারছেন না। তখন অনন্তরায় হয়ে মা বললেন—“তোমায় এগো, আমি একটু পরেই আসি। শীঘ্রই তোমাদের সাথে মিলিত হব”, সেখা হয় হয়।

“কে যায়?”—প্রকৌশলীর রবে হঁকার এল। মায়ের অদূরবতী স্থান থেকে। কাছে এলে এখানে গোল আবলুব কাঠের মত গাছের রাখ, তীব্র মত তীর্থ ও বিহারের চেহারা। আবার হঁকার এল।—“কে গো তুমি? এ অদ্যকারে কোথায় যাচ্ছ?” তিনি অবশেষে এবং নির্ভর প্রশ্নকাঠামো বললেন—“বাবা, আমি তোমায় মেয়ে আমার, দক্ষিণেরে তোমায় জামাইয়ের নিকট যাচ্ছিলাম। সুরীয়া এঙ্গিয়ে গেছে; একে অবধি, তার উপর অচেনা। বাবায়, আমি দিশে হাসিয়ে ফেলেছিলাম। তোমাদের দেখে যোগ প্রাণ এল। ডাকাত মা ও ডাকাত বাবা একেবারে পরিপূর্ণ রূপান্তর হয় গেল। ডাকাত মা রাখা কর রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করলে ও একটি দোকান শেখরোয় ব্যবস্থা হল। আর ডাকাত বাবা সারাজাত লাঠি হাতে হাতার বেল পাঠানির তীর্থ লাগল।

পরদিন সকালে বিদায়ের পাশ। ডাকাত বাবা ও ডাকাত মায়ের চক্ষু দুটি অর্কুতে তলমল। পথে যেতে যেতে কোনো কথা কাঞ্চন শুনতে ডাকাত মা মেয়ে সারাজাতে থাকতে লাগল। মেয়ে সারাজাত পাতান বাবা ও মায়ে কাটো থেকে দক্ষিণেরে বাবার প্রতিরূপের আদায় করে পুনর্যায় দক্ষিণেরে অভিমুখের হয়ে লাগলেন। বাবার পথে মেয়ে ও মায়ের দিকে ফিরে ফিরে তাকায় আর আচালে চেখ মেয়ের মায়ের অবস্থাও তখনি। একদিনের পরিপূর্ণে এক খামি অস্তরপূর্ণ সত্য সত্যি অভাবনীয় ও অসুস্থতা।
রায় যখন ডাকাত বাবার অন্তর্ভুক্ত ডাকাত বদকুরা তাকে জিজ্ঞেস করতেছে—“তোমার কি হয়েছিল? এমন একটা মাঝে ছেড়ে দিলে?” উত্তরে ডাকাত বাবা বলেছে, “দেখোমৃ, এ ডাকাত কালীর পুজো করে আমার। ডাকাতি করতে বেঁধেই, তিনিই যেন আমার সামনে আবির্ভূত। আমি অভিজ্ঞতা হয়ে গেলুম। ও মানবী নয়, ও দেবী।”

মায়ের জীবন ছিল অতিশয় সরল ও অনাড়ম্বর। তিনি ছিলেন মহত্ত্ববাদী মায়ের। ছেলেদের ও ভাতদের বাধা দেখে তিনি অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়তেন। কেউ অস্তিত্ব হয়ে পড়লে তিনি কোন হস্তে সেবা ও শুশ্রুষা করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে বয়সের প্রাপ্ত বয়সের মায়ের জীবনে এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছিল।

ঠাকুরের অদর্শের পর মা আনন্দকিন্নর মায়ের ছিলেন। এই বিনাশ সময়ের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্থ অভিনববাণী বহু শত শত হারাম হাজার তুর্ক মায়ের চরণগোলতে নিজেদের জীবন-মন আর্পণ করে দেখা হয়েছিল। মায়ের নিকট কোন প্রাণী এসে রক্ত-হস্তে ফিরে বেরতে না। একবার এক ভক্ত স্ত্রীলোক রোগশয্যায় শায়িত মায়ের দর্শন করতে এসেছে।

বারী স্ত্রীলোক ভক্ত। কিছুদিনের পথ ছাড়েন না। বিবর্ধতা মায়ের কর্মশক্তি হওয়াতে তা তৎক্ষণাৎ ওকে তেজবর্দে প্রবেশ করতে আদেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, পঞ্চমোক্তাত্ব এবং পুস্তি পার্শ্বের অবস্থাকে ভক্ত শ্রীলোককের জয় প্রাপ্ত দেখাতে প্রয়োগ করলেন।

শত শত পুরুষ ও শ্রী ভক্ত তাঁর চরণবৰ্ত্তী প্রতাপিত হয়ে আসত। তিনি শতাব্দির বহু কাউকেই ফেরাতেন না। দর্শক সামনে লজ্জাগ্রস্ত ও শোক প্রকাশ করে। একটি মোটা কথায় সমস্ত অবস্থা আচ্ছাদিত করে বলে থাকতেন ঘটার পর ঝট। আর ভক্তরা একাকী একের পর এক স্বাভাবিক সীমার তন্ত্র হত।

ঠাকুরের ভাবায়—“ও সাধারণ মানুষ নয়, ও সারদা, জনদানিয়া, জন দিতে এসেছে।” মায়ের পতিভক্তি ও পতিসেবা সত্যি অসাধারণ। ভোরেবেলা চারটার সময় বাড়ী যায় করে প্রাত্রুটি ও শান্তি সমাপন করে হামতে দুরতেন।

ঠাকুরের ভাব—“আর আসস যা হয়।” মায়ের আসস পথে একটি ভক্ত স্ত্রীলোক মায়ের বললে—“মা, আমায় দিন? আমি ঠাকুরের কাছে দিয়ে আসিছি।” মা ভক্তকে বিস্মৃত হয়ে পাড়েন না, খাবারের খালা দিয়েছিল।

পরে ঠাকুরের মায়ের বললেন—“একে যেতে খাবার পাঠিয়েছিলেন কেন? জান না ও কী রকম প্রতিজ্জ্বলিত স্ত্রীলোক? তুষার সঙ্গে খাওয়া হল না।”

মা বললেন—“কী করব, চাইলে যে।” ঠাকুরের বললেন—“ভবিষ্যতে আর এর কোন কোন লোককে দিয়ে খাবার পাঠাবেন।” বার তৎক্ষণিক জবাব—“কে এসে আমাকে ধরলে আমি না লেগে পারব না। আমি যে মা।”

মায়ের পতিভক্তির আর একটি অনল উত্তীর্ণ।

মায়ের কাছে একটি ভক্ত স্ত্রীলোক এসেছেন দর্শনমূলক হয়ে। মায়ের মাঝে আসেন, অপূর্ব রূপসী। মা জিজ্ঞেস করলেন—“কেমন আছ মা? সব খবর তালা তো?” ভক্ত স্ত্রীলোক উত্তর দিলেন—

“ভালই আছি মা, সাথে ভাল। তবে অন্যতম একটি মাত্র জাল বিষের কাটাত মত বেঁধে। যামি বড়ই কুছুরপ।” মা পুনর্ভাবিত হয়ে বললেন—“এসব
মায়ের শেষ বাণী—“মা যদি শান্তি চাও, কারা দোষ দেখা না, দোষ দেখে নিজের। সারা জগতকে আপনার বলে ভাবতে শিখো।”

মা একাধারে ছিলেন করুণাময়ী, স্নেহময়ী, শ্রীমানকৃষ্ণের উত্তরসাধিকা ও ঠাকুরের ভাববানা প্রাচর্যকারিণী, হীরাঠাকুরকে দেখেননি, কিন্তু মায়ের দর্শনলাভে ধন্য হয়েছেন, তারা মায়ের ভেতরই শ্রীঠাকুরের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। মায়ের শ্রীচরণে ঐকান্তিক প্রার্থনা—“মা, তোমার জন্মের ছোটে আমাদের অজ্ঞানস্কার দূর কর, আমাদের মানুষ কর। তোমার আদর্শ ও উপদেশ শিরোধারা করে যেন জীবন অতিবাহিত করতে পারি।”

জননী সারদার্দেবী রামকৃষ্ণের জগদ্ধূর্ম্ম।
পাদপদ্মে তোমঃ শ্রীশ্রী প্রণমমি মূৰ্ত্তিঃ।
কে?
ঈশ্বরকুমার ঘোষ, প্রথম বর্ষ, কমাস

তামিল্লা যে আমানইশা
যখন লোহে মরে—প্রতি ঘরে ঘরে
আধারবর্তী—দিশা,
মেরমি ভোকিয়া ধনিল সেদিন
তোমারই আহ্বানে,
জাগে অত্যাচারিত পদলিত
আছ যত সন্তান।
দিকে দিকে তাঁহো কুস্তকর্তব্যে
়ুল যে নিত্রান্ত, চারিদিকে তাঁহো দেখিব সবাকার
কর্ম-প্রবাহ তরঙ্গে
বিশ্বমাণোর—আসল সত্য
যা ছিল স্বো ঘরে
সকলই আবার—প্রকাশিত ভরে,
তোমার আঘাত ঘরে।
এক খুঁক উত্তর

শ্রীজলকুমার বাগ, ১ম বর্ষ ভিত্তি

জনাকীর্ণ পথে হাটতে হাটতে, ট্রেনে-বাসে
কুলতে কুলতে দেশের কথা, জনের কথা
ভাব কি দেশ প্রেমের সুপ্রথিত

বীজ নয়?

আমার তোমার সাধারণ ক্রিকেট খেলা?

না হয় আমার-সংকীর্ণতার মধ্যেই ধরলাম,
কিন্তু ইওয়াই-ইটিজের খেলায় আমারকের
জোরালো সমর্থন, সেকি আমারসংকীর্ণতা?

ক্যালকুলেসের নিরন্তর একমুখীনতাকে সরস করতে,
জীবনের ছানে আনা উত্তর থেকে প্রতিক্রিয়া
তা কি কোন গাণিতিকের কিছু খুঁজে পাওয়া

থেকে কম যায়?

জীবননান্দের কিশোরীর চায়া ধোয়া চাল,
আম-জাম কাঠালের গন্ধ ভরা কত কথা,
কবিগুরুর ভূমি-ভূমীর সোনার বাংলা,
ঊগার প্রেমের গন্ধতৃঙ্গ সব মিলিয়ে কি

এক কথা শোনায় না?

তোমার পোষাক-আমার পোষাক সব যদি
সেটেনের ধারে বসে থাকা টেলারের
কাপড়ের ভগায় মিলিয়ে এক হয়ে যায়,
তা কি বিশ্বজীনতা, জাতীয় সংহতিকে

সামাত্ত তুলে ধরে না?

ঝাসা-ঝাসি ভিড়ে ট্রেনের বাসের কুলতুল
বহুভাষী রক্ষ্যবাহী পোষাকের মাঝে
ঊগার আসে দেখে মহান কলকাতার মিলনমন্দ,
তা কি থুলো মাথা তোলার সরাল্যাকে থান করে?

নিশ্চিত রাতের আজানা তারা জল-জল করে
সূর্য প্রচ্ছদবায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় যে সূর্য তো
সূর্য থেকে ধার করা। আলো নয়?
Late Lament
Srimat Swami Dhyanatmanandaji
—Our Former Secretary
Srimat Swami Santoshanandaji Welcomes
Swami Shraddhananda, in Ex-student of the Home
[Swami Souryananda, Another Ex-student with Shraddhanandaji]

Swami Shraddhananda
Head of Sacramento Centre, California

Swami Santoshanandaji
With two scholars of Repute

A meeting of The Milan-Utsab with Swami Santoshanandaji
in the chair Swami Dhyyanatmanandaji reading his paper
স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও বিদ্যাধী আলম্ব

স্বামী অমলানন্দ

অবতার বর্তমান শ্রীরামকুশের সাক্ষাৎ পার্থিদ পরম পুজাপাদ শ্রীম ব্রহ্মাণ্ড মহারাজের রূপসভা বিদ্যাধী আলম্বের জন্মানন্দিক, শ্রীম ধ্যানাত্মানন্দ মহারাজ গত ২৬ শে মার্চ (১৯৮৭) দৌলতাবাদ পুণ্যদিনে মহাপ্রায়ণ করেন।

গত বেশ কিছুদিন পূর্বের, বড়ারেটুস ইন্তাম-দিতে শ্রীম ধ্যানাত্মানন্দিক ভুগছিলেন। ডিসেম্বরে তা খুব বেড়ে যায়। তাঁর ভাষা আর-এন. চাটানিক চিকিৎসাতে অনেকটা ভাল বোধ করেন।

শ্রীমান তিব্বতীর ভিত্তি পুজোতে মঠ সকলে গিয়ে আপনাদের ধারণ করে বিকেলে বেলঘরিয়া ফেরেন।

ইদিনীর নিজের ঘরেই স্বামীর ভাগ সময় ধ্যান-জগে কাটাতেন। সকালে মন্দির এবং বিকেলে পুজো অন্যদিক মহারাজের বাড়ী লেন এলে বসতেন।

স্থানীয় ভক্তরা বিকেলে এলে প্রশেষ ও আলাপাদি করতেন। দৌলতাবাদ এর মধ্যে এসে প্রদান ও আলসসূচী করতেন।

দৌলতাবাদের দিনের রকম সকালে মন্দির এসে শ্রীমান তিব্বতীকে আবিরি দিয়েছিলেন এবং বিকেলে লেনে বসে গলার করতেন। তাঁর গলা ছুটি আলাদান নিজের ঘরে দিকে রোধ না হয়।

স্বামীর সত্তা ভক্তরা খাদ্য খাওয়ানো বললেন। তাঁর ঘরে ধরে বারণাসী চর্চার বসতি দেওয়া হয় এবং এই চর্চার ঘরে এলে বিহানের শুয়ের দেওয়া হয়।

তাঁর স্থানীয় ফাস্কারাবাদের আম্র হয় এবং তিনি এসে নাম বলে ঘোষণা করতেন।

সমস্ত ঘটনা ফুটপাটিতে অধ্যাত্ম উদ্যোগ মধ্যে ঘটে যায়। শেষ সময় তাঁর কোন কথা মানে না। চোখে মুখে একটি প্রশস্তির ভাব স্পষ্ট ছিল। আনন্দময় প্রশ্ন সম্পাদিত আনন্দ করেন। অন্তর্ভুক্ত লেখা পাঠকের অন্যান্য মধ্যে শেষ নিহিত স্থান করেন।

সাধু সন্নিধানে বেলঘরের খবর দেওয়া হয়। মঠ থেকে পুং সত্যকৃষ্ণ মহারাজ ও পুং প্রিয়ালন মহারাজ এসে পড়লেন।

উদ্বোধন, সাধারণ, নর্ঙ্যা, গোলপার্ক প্রতিষ্ঠাতা আলম্ব থেকে মহারাজার পরে এলেন। দিনের হলো পরের দিন সকাল ১০টায় তাঁর ঘরে বেলঘর মঠে নিয়ে যাওয়া হবে।

পরের দিন শোভাযাত্রা শেষ হয়ে বেশ। ১২টা পুত্তর ১২টা ৪০ মিনিটে অলসসূচী করা হলো।

ফোন এবং বেলঘরের খবর ঘরে দলে দলে অভাব ও প্রাক্তন ছাত্রেরা বেলঘরিয়া ও বেলঘর মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন।

মঠের সাধু আলম্বরাজরা বেল ঘাট, ভজন, কীর্তন দ্বারা এবং সমবেত ভজন, ছাত্র, অগণিত মানুষ চোখের কাছে তাঁকে শেষ আলম্ব নিবদ্ধ করে।

তাঁর চীনাতে একোদশ দিন ১৭৪৫১ে সোমবার বেলঘর মঠ সাধু ভাওয়া এবং বেলঘরিয়ার মঠ ২০৪৫৬ তারিখে সাধারণ উদ্বোধ্য অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সেই সময় বছর খেয়ে আশা করেছিলেন শ্রীম ধ্যানাত্মানন্দের জীবন-ইতিহাস সম্পাদিত একটি পুস্তিকা বেরিয়ে করবে; যেমন বেরিয়েছিল শ্রীম সন্নিধান-নন্দজাতির চীনাতেন পর কিছু তখন তা সম্পাদিত করা হয় সম্পন্ন।
হয়নি। তখন থেকে অনন্তরাগিরা আশা করে আছেন অন্যতম এক্সক্রোম মুভেনিতে তাঁর সাধ্যে একটি প্ররস্ত প্রকাশিত হবে।

মৃনিল হচ্ছে—বর্তমান লেখককে নিয়ে। না আছে তাঁর দৈহিক দায়িত্ব, না আছে তাঁর লেখার সামাজিক। অনন্তরাগিরা তাঁর সঙ্গে ৫০ বছর কাঠিয়েছে; কাঁটা থেকে দেখতে—প্রদূষণ মেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছিল। পেয়েছি পেরেন। কিন্তু তাঁই হয়েছে বাধা, যখন লিখে বসি তখন কলম থেমে যায়। চোখের জলে ভেসে যায় সামনের কাগজ; কিছু গুঝিয়ে লেখা হয় উচিত না।

কিন্তু উপায় নেই; কিছু লিখতেই হবে। না হলে হবে কর্তব্যবৃত্তি, হয়তো বা প্রত্যাখ্যাত। লেখকের বিনীত নিবেদন—পাঠকরা যেন এই প্রবন্ধকে কোনো পুরাণ জীবন বলে না ধরেন। তবে এই বই বলা। যায়—ভিত্তিতে যদিও কোনো যোগাযোগ লেখক এ বিষয়ে লেখনামুখ্য করতে থাকে তবে তাঁর কিছুটা সত্যিকার হবে।

* * * *

গ্রন্থম তাকে দেখি ১৯৩৬ খ্রী। এই প্রাচীন সময়ের প্রথমাভ্যাসে 'গৌরীপুরে বিষয়া আশ্রম উপস্থিত হয়েছিল ভর্তির জন্য। ভর্তির ফরম নিয়ে এবং সৌন্দর্য নির্বিশেষন ছুঁড়ে একটি প্রাচীন একটি প্রশ্ন করে যখন প্রথম থেকে এলাম তখন সামনের পুষ্করিত ও আশ্রমের মুদ্রার পরিবেশ দেখে মনে হলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে একটি এল ভেসে এল পুষ্করিত দক্ষিণ পাড় থেকে খানিকটা বজ্রনিয়নের মত। যেটা নিয়ে জানালে একজন প্রথম নারাজ নারাজ নাঙ্গাল্পাঙ্গালকে বলেছে একটু ভয় পেলাম। আশ্রমের শাস্তিময় জীবন বাসনের বাসন নিয়ে আবেদন ফরম আনতে এলাম কিন্তু এই আশ্র তাঁকার কি আশ্রমের অল্পকূল।

পরে জানলাম, ইনি নুপেন মহারাজ। মাদারীপুরের বীরবালক—বাহীনতার মুখ্যের এক সফল সন্ত্রাস। বয়স থেকে ১৪।১৫, দেশব্যাপী চিকিৎসায়নের সঙ্গে ইনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছেন। টেলিফনের উপর দাড়িয়ে অথবা কাছাকাছি চড়ে এই বীর বালক ঘটার পর ঘটা প্রামোকুল রেকর্ডের মত বক্তৃতা দিয়েছেন। মাদারীপুরের সরদার মায়ূরের চর, বড় সেনের বাড়িতে যখন তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন কয়েক শ শ্রোতা তখন চোখের জলে দেখ সেবার শপথ এই হর্ষ করেন।

সর্কার বাহাঙ্গুর একমাত্র চেলকে চেলের বাইরে রাখ। বিপজ্জনক মনে করেন। কালামুখায় শেখা কোট বসত; মুপেন্দ্রনায়নের সাথা হল। এবার পুলিশ তাকে জোরের নিয়ে যাবে।

কিন্তু এদিকে এই খবর যখন প্রাচীন হলো, তখন দুর্গাধির আশ্রমের মূলধন একেবারে ধরে ঢাক, তেলো, সাহা বাজিয়ে উল্লবধিনি করে এমনি অবসান শীঘ্র করলে পুলিশের কর্তৃত্ব ভয় পেয়ে গেলেন তাকে গেলান করতে। লোকে বলতে লাগল—নুপেনের বিরুদ্ধে সাক্ষাত নাকি।

না, নুপেনের জলে যাওয়া হল না; এবং বিরুদ্ধ হল না। তিনি এম.এ. পাশ করে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় যোগদান করলেন। নুপেনদাকে আমারা পেলাম আশ্রমের ভাঙ্গা রূপে (গৌরীপুরে আশ্রম)। ভাঙ্গা দেখেন, গোয়াল তদারকি করেন। তিনি সে ইতিহাসের এম.এ. সংক্ষেপে অগাধ জানা, এবং বিশ্বাস কেউ তখন টের পেত না। আমরা জানতাম, নুপেনদান, নরেনদান (এখন বামী শোধানেন), বিমলান,

RAMAKRISHNA MISSION CALCUTTA STUDENTS' HOME